'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর

আলোচনা

"বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।" "কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশী দিন টেঁকিবে?" উত্তর—"বলা বড় শক্ত, বোধ হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।"

বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ—৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

(শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলি, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৩ ও ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য—বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ।) উল্লিখিত প্রসঙ্গের উদ্ধৃত অংশ অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'য় (শ্রাবণ ১৩০১, ২৪৯ ও ২৪৪ পৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রোফেসার্

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ

মাঘ ১৩৩৪ আট আনা
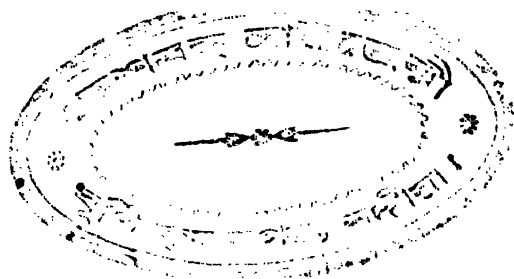
'আলোচনা'-সম্বন্ধে মন্তব্য

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' 'বিধবা'-সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলি লিখিয়াছিলাম। (ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র ১৩২৭; শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ, ফাল্গুন ১৩২৮; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)। এই প্রবন্ধাবলিতে সমাজ ও সাহিত্যের দিক্ হইতে বিধবা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শেষ কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়ীকৃত ছিল। সম্প্রতি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিএ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত হওয়াতে অনেক ছাত্র ও ১।১ জন শিক্ষক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর উল্লিখিত আলোচনা পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পুরাতন 'ভারতবর্ষ' খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই পাঠ-প্রবৃত্তি প্রশমিত করার অসুবিধা জানাইয়া উক্ত প্রবন্ধ কয়েকটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। তাহারই ফলে সেগুলি 'ভারতবর্ষ' (মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৮; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। বিধবাকে কাব্যের বিষয় করা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনাও ('ভারতবর্ষ' ভাদ্র ও চৈত্র ১৩২৭) প্রাসঙ্গিকবোধে এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে ('ভারতবর্ষ' আষাঢ় ১৩২২) এই আখ্যায়িকার নামকরণ-সম্বন্ধীয় আলোচনাটুকুও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ফলতঃ পরীক্ষার্থীদিগের প্রয়োজনীয় অনেক কথাই এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

প্রথমোক্ত প্রবন্ধাবলি 'বিধবা'-সম্বন্ধে লিখিত হওয়াতে সেগুলিতে রোহিণী-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে ; রোহিণীর সহিত জড়িত বলিয়া গোবিন্দলাল-সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা আছে ; রোহিণী-গোবিন্দলালের সহিত যোগসূত্রে ভ্রমর-সম্বন্ধেও অল্প-বিস্তর আলোচনা আছে। কিন্তু তাহাতে ভ্রমর-চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা করা হয় নাই। সেই ত্রুটি-সংশোধনের জন্য, পরীক্ষার্থিগণের প্রয়োজন-বোধে, পরিশিষ্টে ভ্রমর-চরিত্রের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ইহা ছাড়া কাব্যকলা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথার বিচার পুস্তকে আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পরীক্ষার্থিগণের উপকারে লাগিলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইতি

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৪

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা
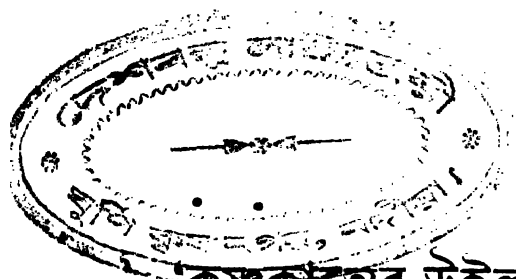
'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর আলোচনা

'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামের সার্থকতা

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর প্রণয়বৃত্তান্ত মর্ম্মভেদী সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কাহিনীর জটিলতার মূলে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল্। উহাই ভবিষ্যৎ বহু অনিষ্টের মূল। প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইলের কথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জাল উইল্ লইয়া। তাহার পরবর্ত্তী তিনটি পরিচ্ছেদে এই উইল্-সূত্রে শুধু অপ্রধান পাত্র কৃষ্ণকান্ত রায় ও হরলালের নহে, রোহিণীর চরিত্রেরও একদিকের বিকাশ। তাহার পরে গোবিন্দলালের চরিত্রের প্রথম পরিচয়। উইল্ চুরি ও পরে জাল উইল্ চুরির চেষ্টায় এই দুইটি চরিত্রের অধিকতর বিকাশ ও জটিলতার বৃদ্ধি এবং ভ্রমরের চরিত্রের প্রথম পরিচয়। তাহার পর আবার শেষ উইলে ভ্রমরকে উত্তরাধিকারিণী করাতে, বিপদ্ আরও ঘনাইল, ব্যাপার আরও জটিল হইয়া পড়িল। অতএব দেখা গেল উইল্ যেন গ্রন্থখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে। ঘটনাপরম্পরা ও চরিত্র-বিকাশ, উভয় ব্যাপারের মূলে এই উইল্; ইহাই আখ্যায়িকার মেরুদণ্ড। উইল্ না থাকিলে এইভাবে চরিত্রবিকাশ ঘটিত না, ঘটনাস্রোতও বহিত না। সুতরাং এক্ষেত্রে নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—ঐক্য ও অনৈক্য

শেক্‌স্‌পীয়ার্‌-সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে শেক্‌স্‌পীয়ার্‌ এক শ্রেণীর দুইটি চিত্র ঠিক একই ভাবে অঙ্কিত করেন নাই; বেশ একটু প্রভেদ রাখিয়া, বেশ একটু বৈচিত্র্য দেখাইয়া, নূতনত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধেও একথা খাটে।

তিনি 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই উভয় আখ্যায়িকাতে বিধবার অবৈধ প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; * উভয়ের মধ্যে কতকটা মিল আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রভেদও আছে। উভয় আখ্যায়িকাতেই পতিপত্নীর প্রেম প্রধান আখ্যানবস্তু; অবৈধ প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু; উভয়ত্রই বিবাহিত নায়কের সহিত বিধবার প্রণয়ব্যাপার; উভয়ত্রই যুবতী বিধবা, মাতৃত্ববঞ্চিতা, মাতৃভাববর্জ্জিতা, স্বামিভক্তিরহিতা, পরপুরুষে অনুরাগবতী ও পরপুরুষের অনুরাগপাত্রী; উভয়ত্রই প্রেমিক-প্রেমিকা এই অবৈধপ্রণয়ের সহিত অনেকদিন ধরিয়া প্রাণপণে যুঝিয়াছে, শেষে পরাস্ত হইয়াছে; উভয়ত্রই হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমিক-প্রেমিকা কিছুদিন পরস্পরকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে; উভয়ত্রই আখ্যায়িকা-কার এই অবৈধ প্রণয়ের শোকাবহ পরিণাম ঘটাইয়াছেন; উভয়ত্রই তিনি স্পষ্টবাক্যে এই অবৈধ প্রণয়ের দোষ-ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত উভয় আখ্যায়িকায় মিল আছে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি দুইজন প্রণয়বান্—নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র; রোহিণীকেও দুইজন প্রণয়জ্ঞাপন করিয়াছেন—হরলাল ও গোবিন্দলাল; এ অংশেও উভয় আখ্যায়িকায় মিল আছে।

---

* 'বিষবৃক্ষে' অঙ্কিত বিধবাগণের, বিশেষতঃ কুন্দনন্দিনীর চরিত্র-সমালোচনা 'ভারতবর্ষে' (১৩২৮ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যার) দ্রষ্টব্য।

কিন্তু প্রভেদও যথেষ্ট আছে। ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছি।

কুন্দের প্রতি দুইজন প্রণয়বান্ বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রের প্রতি কুন্দের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নাই। পক্ষান্তরে, রোহিণীর হৃদয়ে প্রথমে হরলালের ও পরে গোবিন্দলালের জন্য লালসার সঞ্চার হইয়াছিল। হরলাল অবশ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য রোহিণীর প্রতি প্রণয়ের ভান করিয়াছিল; এ অংশে বরং হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের প্রণয়ের ভান ইহার সহিত তুলনীয়। দেবেন্দ্র ও হরলাল উভয়েই মন্দলোক হইলেও উভয়ের চরিত্রে প্রভেদ আছে। কুন্দরোহিণীর চরিত্রে ত সম্পূর্ণ প্রভেদ। কুন্দ স্থির, ধীর, গম্ভীর, অসামান্য সরলা, শান্তস্বভাবা, অবাক্‌পটু বালিকা; তাহার প্রণয় নীরব, গভীর, একনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে রোহিণী বয়সে কুন্দ অপেক্ষা সম্ভবতঃ বড়, প্রগল্‌ভা, সাহসিকা, চতুরা (জাঁহাবাজ); তাহার তীব্র লালসা, অতৃপ্ত বাসনা, সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ নহে। (হীরাও তাহার তুলনায় একনিষ্ঠা।)

ঘটনার সমাবেশে ও প্লটের বিবর্ত্তনেও বিস্তর প্রভেদ। 'বিষবৃক্ষে' প্লটের যতটা জটিলতা আছে (একাধিক অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার আছে), 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ততটা নাই; হরলাল-রোহিণীর ব্যাপার-মাত্র একটা ফ্যাংড়া আছে, কিন্তু তাহা প্রথম দিকের ২।১টি পরিচ্ছেদেই (৩য় ও ৫ম) সমাপ্ত হইয়াছে। কুন্দর কুমারী-অবস্থা হইতেই নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয়ের সূত্রপাত হয়; দেবেন্দ্র তাহাকে সধবা-অবস্থায় দেখিয়া আত্মহারা হয়েন; পক্ষান্তরে হরলাল-গোবিন্দলাল-রোহিণীর ব্যাপারের আরম্ভ রোহিণীর বৈধব্যদশায়। কুন্দর বিবাহের, স্বামীর প্রসঙ্গ আছে; রোহিণী যে কবে বিধবা হইয়াছিল তাহার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। তাহার কুমারীজীবন ও বিবাহিত জীবনের চিত্র নাই। কুন্দর স্বামীকে অবশ্য মনে ছিল, কেননা নিতান্ত শিশুকালে বিবাহ হয় নাই, কিন্তু

তাহার স্বামিস্মৃতিতে মাধুর্য্য ছিল না। পক্ষান্তরে রোহিণীর স্বামীর প্রসঙ্গই নাই। এ অংশে * (ও চরিত্র-অংশে) রোহিণীর বরং হীরার সহিত মিল আছে। কুন্দ-রোহিণীর প্রথম প্রণয়সঞ্চারের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ অমিল।

* বাস্তবজগতে অবৈধ প্রণয়, হয় নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির সহিত, না হয় আবাল্যপরিচিত কোন প্রতিবেশীর সহিত, ঘটিবার সম্ভাবনা; কচিৎ অন্যত্রদৃষ্ট ব্যক্তি বা গৃহে আগত আত্মীয়-কুটুম্বের বা অতিথির সহিত ঘটিতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক সময়ে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, হয়ত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও পরিবার-ভুক্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং এক পরিবারে বাস করিলেও এরূপ আসক্তি সব সময়ে ঠিক সম্পর্কবিরুদ্ধ (incest) শ্রেণীতে পড়ে না। যে সকল আখ্যায়িকা-কার হিন্দুসমাজের অনাচার পাঠকদিগের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য কুৎসিত বাস্তবচিত্র (realistic picture) অঙ্কিত করেন, তাঁহারা এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ আসক্তির চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। (কাব্যনাটক হইতে এ সব নোংরা জিনিশের আর দৃষ্টান্ত দিতে চাহি না।) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' একান্নবর্ত্তিপরিবারে ধনীর অন্তঃপুরে বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার ঘটাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সম্পর্কবিরুদ্ধ নহে। কুন্দ তারাচরণের বিধবা পত্নী, তারাচরণের মৃত্যুর পরে অভিভাবকহীনা 'কুন্দকে সূর্য্যমুখী আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন।' তারাচরণকে 'সূর্য্যমুখী ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন' বটে, সেই ভ্রাতৃস্নেহের বশে তিনি 'ভদ্রকায়স্থের সুরূপা কন্যা' কুন্দকে 'ভাইজ' করিয়াছিলেন তাহাও বটে, কিন্তু তারাচরণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভ্রাতা ছিল না, সে সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহের দাসী বিধবা কায়স্থ-কন্যা শ্রীমতীর

* 'হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই।' ('বিষবৃক্ষ' ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

পুত্র, মাতার কুলত্যাগের পর ঐ গৃহে সযত্নে প্রতিপালিত, এই পর্য্যন্ত। সুতরাং কুন্দ ঘটনাচক্রে নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরিকা হইলেও তাঁহার সহিত নিঃসম্পর্ক। *

'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র বন্ধুপত্নীর সহিত 'আলাপ' করিতে গিয়া মোহাভিভূত হইল, ইহা প্রতিবেশীর প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। যাহা হউক এটি অপ্রধান আখ্যান। 'বিষবৃক্ষে' অবৈধ প্রণয়ের প্রধান আখ্যানে একান্নবর্ত্তি-পরিবারে উক্তরূপ ঘটনার সমাবেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অন্য পথ লইয়াছেন। রোহিণীর প্রথমে হরলালের, পরে গোবিন্দ-লালের প্রতি আসক্তি প্রতিবেশীর সহিত যোগাযোগের দৃষ্টান্ত। ইহারা সজাতি হইলেও নিঃসম্পর্ক। ('দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম-সুবাদ মাত্র, সম্পর্কে বাধে না'—হরলালের এই উক্তি স্মর্ত্তব্য। ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) পল্লীগ্রামে অবরোধপ্রথা তত কঠোর নহে, প্রতিবেশীদিগের অন্তঃপুরে অনেক সময়ে পুরুষদিগের গতিবিধি থাকে, বাল্যকাল হইতে 'ঝিউড়ি'দিগের সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা থাকে, পথেঘাটে ও অন্তঃপুরে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তার বাধা নাই। ('হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন।' ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) উপরি-নির্দ্দিষ্ট দুইটি প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভাল; তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি স্থল ভিন্ন অন্যত্র এই দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকেরাও অনেকে করিয়াছেন, যথা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার', ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'বিরাজমোহন' ও 'ভিখারী', শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা নাটক, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শান্তি

* সংস্কৃত-ভাষার সাহিত্যে অন্তঃপুরিকার সহিত প্রণয়ের বহু ঘটনা আছে, তবে সে সব স্থলে অবশ্য বিবাহিত রাজার কুমারীর সহিত প্রণয়, বিধবার সহিত নহে। ক্বচিৎ দুই একস্থলে সধবার সহিত প্রণয়ের ব্যাপারও এই সাহিত্যে আছে।

কি শাস্তি' নাটক, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রনাথ' ও 'পল্লী-সমাজ,' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দোটানা' ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ শুধু যে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, বিধবাবিবাহের পক্ষাবলম্বনকারী পণ্ডিতকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, কুন্দের বালবৈধব্যের অনাথিনীত্বের প্রসঙ্গ উঠিলে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন তাহা নহে, তিনি মোহের চরম অবস্থায় শ্রীশচন্দ্রের সহিত (পত্রযোগে) বিধবাবিবাহের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিয়াছেন ও কুন্দকে বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। অতএব বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাই বলুন, কুন্দ (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যানুসারে) নগেন্দ্রনাথের বিবাহিতা পত্নী। পক্ষান্তরে, গোবিন্দলাল কোনও দিন বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। রোহিণীর নিকট সে প্রস্তাব করেন নাই, সরাসরিভাবে রোহিণীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন।

এই প্রভেদের কারণ কি? গোবিন্দলালের স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল, তাহা ত নগেন্দ্রেরও ছিল; বরং ভ্রমর গোবিন্দলালকে সন্দেহ করিয়া আগেভাগেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন, সূর্য্যমুখী বিধবাবিবাহের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করেন নাই; সুতরাং গোবিন্দলালেরই বরং পত্নীর অপরাধের অজুহাতে বিধবাবিবাহ করিবার সুযোগ ছিল। রূপ-মোহের প্রথম অবস্থায় গোবিন্দলালের মাথার উপর জ্যেঠা মহাশয় ও মাতা-ঠাকুরাণী ছিলেন, তাঁহারা এরূপ অপকর্ম্ম করিতে দিতেন না। নগেন্দ্রনাথ স্বাধীন; কিন্তু ইহাই এই প্রভেদের একমাত্র কারণ নহে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন, সেখানে ত বিধবাবিবাহ করিতে পারিতেন। আসল কথা, এক্ষেত্রেও কুন্দ রোহিণীর চরিত্রের প্রভেদই ঘটনার এই প্রভেদের কারণ। কুন্দর প্রণয় অবৈধ হইলেও একনিষ্ঠ, কুন্দর কুমারী-অবস্থা হইতেই ইহা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, সুতরাং মন্ত্রপূত

বিবাহ তাহার বেলায়ই সাজে ; পক্ষান্তরে, রোহিণী লালসাময়ী, প্রথমে হরলালের সহিত তাহার আচরণে (১ম খণ্ড ৩য় ও ৫ম পরিচ্ছেদে) ও শেষে নিশাকরের সহিত তাহার আচরণে (২য় খণ্ড ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদে) বুঝা যায় তাহার প্রণয় একনিষ্ঠ, অবিচলিত, নির্ম্মল নহে, লালসাই তাহার হৃদয়ে প্রবল। হরলাল সত্যরক্ষা করিলে সে হরলাল-দ্বারাই লালসা চরিতার্থ করিত, সে মোহ কাটিয়া যাইবামাত্র 'গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী'র সুখ দেখিয়া সে হিংসা করিতেছে (১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ), ইহা একনিষ্ঠতার লক্ষণ নহে। ফলতঃ অবৈধ হইলেও সরলা কুন্দর প্রণয়ে যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আছে, রোহিণীর তীব্র লালসায় তাহা নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছে পিতৃ-দ্রোহী ধাপ্পাবাজ জালিয়াত হরলাল। কিন্তু বেশ বুঝা যায় ইহা তাহার ধাপ্পা-মাত্র। সে সেকেলে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত পিতাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া উইল্ পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টায় কৃষ্ণকান্ত রায়কে জানাইয়াছে, 'কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে একটি বিধবা বিবাহ করিব।' 'ইহার কিছু পরে হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবা-বিবাহ করিয়াছেন।' (১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) অথচ তাহার পরে রোহিণীর কাছে যেরূপ কথা বলিতেছে তাহাতে জানা যায় যে সে তখনও বিধবা-বিবাহ করে নাই। হরলাল রোহিণীকে ঐ লোভ দেখাইয়া উইল্ চুরি করিতে প্ররোচিত করিল, তাহার পর কার্য্যসিদ্ধি হইলে সত্যভঙ্গ করিল। (১ম খণ্ড ৩য় ও ৫ম পরিচ্ছেদ।) ফলতঃ ইহা বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব নহে, বিধবা-বিবাহের (travesty) ভেংচান। (নতুবা বিপত্নীক হরলাল বিধবা-বিবাহ করিলে বরং শোভন হইত।) পক্ষান্তরে, 'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র কুন্দকে বিধবা-বিবাহ করার প্রস্তাব করে নাই।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-কুন্দর প্রণয়-ব্যাপার যখন চরমে উঠিল, তখন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গৃহে রহিলেন—অবশ্য অল্প দিনের জন্য ; তাহার পর তিনি সূর্য্যমুখীর বিরহে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিলেন। পক্ষান্তরে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ২।১ বার পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোবিন্দলাল-রোহিণীর ব্যাপার যখন চরমে উঠিল, তখন ভ্রমর গৃহে রহিলেন, গোবিন্দলাল দূরদেশে অজ্ঞাতবাসে রোহিণীর সহিত মিলিত হইলেন। মাতা বর্ত্তমান থাকাতে (যদিও তখন কাশীবাসিনী) গোবিন্দলাল প্রকাশ্যে স্বগ্রামে স্থায়িভাবে এ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, ইহাই এই প্রভেদের অন্যতম কারণ হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এক্ষেত্রেও কুন্দ-রোহিণীর তথা সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের চরিত্রের প্রভেদ ইহার মূলে আছে। কুন্দ অনুরূপ অবস্থায় বোধ হয় নগেন্দ্রনাথ ঐরূপ প্রস্তাব করিলে সম্মত হইত না। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে এবং গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারেও বিস্তর প্রভেদ আছে। ভ্রমরের অভিমান সূর্য্যমুখীর অভিমান অপেক্ষা সাজ্ঘাতিক। ভ্রমরের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত গোবিন্দলালের অসংযমও নগেন্দ্রনাথের অসংযম অপেক্ষা উদ্দাম (যদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষমার্হ)।

কুন্দ একবার সূর্য্যমুখীর কর্কশ ব্যবহারে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট সস্নেহ ব্যবহার পাইয়াছিল, কেননা ইত্যবসরে নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখীর মধ্যে বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। সূর্য্যমুখী স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া বিধবা-বিবাহ দিলেন। (অবশ্য এই অপূর্ব্ব পতিপ্রাণতা ও স্বার্থত্যাগের পরে তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না।) পক্ষান্তরে রোহিণী ভ্রমরের ও প্রতিবেশিনীদিগের দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবে গৃহত্যাগ করিল। সূর্য্যমুখী ও

কুন্দর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এবং ভ্রমর ও রোহিণীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে।

গোবিন্দলাল-সম্বন্ধে আখ্যায়িকা-কার বলিয়াছেন, 'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে।...রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) নগেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে এই কথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা যায় যে, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যার কারণ। এই মর্ম্মান্তিক ব্যাপারে তাঁহার চূড়ান্ত শিক্ষা ও শাস্তি হইয়াছে। আবার তাঁহার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া গৃহত্যাগিনী সূর্য্যমুখীও প্রায় মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন এবং মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রের দোষ গুরুতর, 'প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইল।'

আবার গোবিন্দলালের পাপ নগেন্দ্রনাথের পাপ অপেক্ষা গুরুতর। তিনি শুধু পত্নীত্যাগী ব্যভিচারী নহেন, নারীহত্যার পাতকী। ভ্রমরের প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহারও কঠোরতর (যদিও কতকটা ভ্রমরেরও দোষে)। সুতরাং শাস্তিও গুরুতর হইয়াছে। সে কথা সবিস্তারে যথাস্থানে বলিব।

শেষ কথা, কুন্দ-রোহিণীর শোচনীয় পরিণাম তাহাদিগের স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ। নগেন্দ্রনাথের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা কুন্দ কতকটা নৈরাশ্যে ও কতকটা 'আর সূর্য্যমুখীর সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না' বলিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল। পক্ষান্তরে, লালসাময়ী রোহিণী বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ প্রণয়ীর হস্তে নিহত হইল। উৎকট লালসার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! কুন্দ অবৈধ প্রণয়ে কলঙ্কিতা হইলেও তাহার প্রতি শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের সমবেদনা হয়। পক্ষান্তরে রোহিণীর প্রতি প্রথম অবস্থায় সমবেদনা হইতে পারে। কিন্তু শেষে তাহার লালসা-দর্শনে তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়।

রোহিণীর প্রকৃতি

তুলনায় সমালোচনা আপাততঃ এই পর্য্যন্ত করিয়া এক্ষণে স্বতন্ত্র-ভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আখ্যায়িকা-কার রোহিণীর লালসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রকৃতির আভাস দিয়াছেন। 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহাতে ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।' (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) আবার অন্যত্র (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) আছে —'রোহিণীর চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল-ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলী-কৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।...হেলিয়া দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল।' তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে রোহিণীর গৃহকর্ম্মপটুতা কারুকার্য্যকুশলতা প্রভৃতির কথাও আছে; আমাদের বক্তব্য-বিষয়ে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করি নাই।

উভয় আখ্যায়িকার তুলনায় সমালোচনা-কালে বলিয়াছি, যে কুন্দ অপেক্ষা বরং হীরার সহিত রোহিণীর প্রকৃতির মিল আছে। রোহিণীর প্রকৃতির এই আভাসের সহিত ('বিষবৃক্ষ' ১৫শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত) হীরার প্রকৃতির আভাস পাশাপাশি রাখিলে কতটা মিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। উভয়ত্রই সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করা ইত্যাদি দ্বারা

আখ্যায়িকা-কার বুঝাইতে চাহেন যে সে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্য অনুষ্ঠান করে না, ভিতরে ভিতরে তাহার প্রাণে সখ আছে। অবশ্য ইহাতেই যে চরিত্র মন্দ হয় তাহা নহে। তবে ইহা সুলক্ষণ নহে। এই বিলাসস্পৃহা সংযমের পথে একটি বাধা। হাঁরা দাসী অপেক্ষা ভদ্র-ঘরের মেয়ে রোহিণীর পক্ষে ইহা আরও অশোভন।*

রাঁধিতে রাঁধিতে, 'পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম-কটাক্ষে শিহরে কিনা দেখিবার জন্য, রোহিণী বিড়ালের উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল' (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। আবার জল আনিতে গিয়া, কোকিলের প্রতি প্রযুক্ত 'রোহিণীর ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ' (১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।—এই দুইবার কটাক্ষের উল্লেখে কলা-কৌশলী বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীচরিত্রের উপর একটু বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াছেন।

রোহিণী ও হরলাল

তাহার পর 'ঘরের ছেলে' 'বড় কাকা' ('গ্রাম সুবাদমাত্র') হরলালের সহিত কথাবার্ত্তায়, ধরণ ধারণে, হাবভাবে,—'নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল', 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে' হরলালের এই বাক্যে 'রোহিণী শিহরিল', † হরলাল কিরূপে রোহিণীকে বিপন্মুক্ত

---

* তবে আজকাল অল্পবয়স্কা ও যুবতী বিধবার সধবাবেশ সহর জায়গায় চলিত হইয়াছে। অনেক সময়ে সহরে ও পল্লীগ্রামেও মাতা-পিতা স্নেহবশতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করেন, কন্যার বিধবাবেশ বৈধব্যদশা অপেক্ষাও মর্ম্মবিদারক। ইহাতে যে বিশেষ দুষ্ট আছে বিবেচনা করি না।

† "Good, Sir. why do you start ? and seem to fear Things that do sound so fair ?"—**Macbeth.**

করিয়াছিল সেই পুরাতন কথা তুলিলে রোহিণী 'আপনি' ছাড়িয়া ২।১ বার 'তুমি' বলিল, (আবার উইল্ চুরির পর কখনও 'আপনি' কখনও 'তুমি' বলিয়াছে), হরলাল বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করিলে 'রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল',—ইত্যাদি ব্যাপারে (to read between the lines) তলায় তলায় লক্ষ্য করিবার কিছু আছে। 'প্রেমের কথা' পুস্তকে বলিয়াছি, বিপদ্-উদ্ধারে প্রেমের সঞ্চার হয় এইরূপ বহু ঘটনা কাব্য-নাটকে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও পূর্ব্ব ঘটনায় রোহিণীর হৃদয়ে হরলালের প্রতি ভিতরে ভিতরে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, অনুমান করা যায় না কি? 'প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব', 'করিবার হইত আপনার কথাতেই করিতাম।'—রোহিণীর এই দুইটী উক্তি শুধু কৃতজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। তাহার পর ফন্দীবাজ হরলাল যখন বিধবা-বিবাহের লোভ দেখাইল, তখন রোহিণী ঘৃণিত 'চুরি'র কার্য্য করিতে রাজি হইল—'হরলালের লোভে' (৯ম পরিচ্ছেদ); টাকার লোভে নহে, টাকা সে প্রত্যাখান করিল। প্রথমে হরলাল যখন উইল্ চুরির প্রস্তাব করিল, তখন 'রোহিণী শিহরিল।' দৃঢ়স্বরে বলিল 'পারিব না'। বুঝা গেল, চুরির বেলায় তাহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। কিন্তু এই 'বড় লোভে'র কাছে ধর্ম্মজ্ঞান ম্লান হইয়া পড়িল।

উইল্ চুরির ব্যাপারে রোহিণীর তীক্ষ্নবুদ্ধি, কৌশল ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতেও বুঝা যায় তাহার 'হরলালের লোভ' কত প্রবল; ইহার জন্য সে দুঃসাধ্য কার্য্যেও অগ্রসর। কার্য্যসিদ্ধির পর হরলাল যখন রোহিণীর বড় আশায় নিরাশ করিল, 'যাহা দিবে বলিয়াছিলে তাই চাই' লালসাময়ী রোহিণীর এই দাবি হরলাল অগ্রাহ্য করিল, তখন 'রোহিণীর মুখ শুকাইল'; অপমানিতা মর্ম্মাহতা রোহিণীর তীব্র উত্তর হইতে অতৃপ্ত-বাসনা যুবতী বিধবার ব্যর্থ লালসার কি পরি-

স্ফুট চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়! 'তার চোখে জল আসিতেছিল!' কি গভীর নৈরাশ্যে, কি মর্ম্মান্তিক আশাভঙ্গে এই চোখের জলের উৎপত্তি!

আখ্যায়িকার প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদ শুধু যে উইলের ব্যাপারের জন্য, প্লটের দিক্ হইতে, ঘটনা-পরম্পরা-হিসাবে প্রয়োজনীয় তাহা নহে; এগুলি রোহিণীর চরিত্র-বিকাশের (prelude) সূচনা হিসাবেও রোহিণীর ইতিহাসের অপরিহার্য্য অংশ। যেমন রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে পড়িবার পূর্ব্বে অন্যার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তাহার পর জুলিয়েট্ তাঁহার হৃদয় গভীর প্রেমে নিমজ্জিত করিল, তেমনই রোহিণী গোবিন্দলালকে তীব্র লালসার চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে হরলালের প্রতি লালসাময়ী ছিল, তাহার পর গোবিন্দলাল তাহার হৃদয় তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ করিল। (অবশ্য রোমিওর প্রেম ও রোহিণীর লালসায় অনেক প্রভেদ।)

রোহিণীর প্রতি সমবেদনা

প্রথমেই রোহিণী-চরিত্রের খারাপ দিক্টার আংশিক চিত্র দিয়া আখ্যায়িকা-কার পরে তাহার প্রতি সমবেদনা-উদ্রেকের জন্য, তাহার হৃদয়ের ব্যথার, অতৃপ্ত বাসনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; রোহিণীকে কাঁদাইয়াছেন, রোহিণীর দুঃখে গোবিন্দলালকে দুঃখিত সমবেদনাময় করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ও করুণার্দ্র করিয়াছেন। সমবেদনা-করুণা-সঞ্চারের জন্য আখ্যায়িকা-কার এই স্থলে (১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) তিন তিন বার 'রোহিণী বিধবা' পাঠককে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ('কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু?') হালকা সুরে কোকিলের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বিষাদের সুরে শেষ করিয়া ইংরেজ আখ্যায়িকা-কার Sterne বা Dickensএর মত humour ও pathosএর, হাস্যরস ও করুণরসের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। হরলাল বহুকাল পরে রোহিণীর সুপ্ত বাসনা

জাগাইয়াছিল, আশাভঙ্গে তাহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাই রোহিণী কোকিলের ডাক শুনিয়া কাঁদিতে বসিল। 'কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহা আর পাইব না।* যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।' রোহিণী অনুভব করিল বাহ্য প্রকৃতিতে সকলই আনন্দের সহিত, সুন্দরের সহিত সুরবাঁধা, 'সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা', অদূরে গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়া—'এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা।' 'স এব যমুনাতীরঃ স এব মলয়ানিলঃ', কেবল রোহিণীর হৃদয়ই বেসুরা। 'রোহিণী কাঁদিতে বসিল।' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) স্থান, ক্ষণ, সবই মধুর, সবই উজ্জ্বল, সবই আনন্দময়, কেবল রোহিণীর হৃদয় আঁধার। 'রোহিণী···বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বাল-বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ-জীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হোক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের

* "Quoth the Raven—'Nevermore' : "—E. A. Poe. অবশ্য ইংরেজী কবিতাটিতে কোকিল নহে, কাক।

জীবন রাখিয়া কি করি?' (সপ্তম পরিচ্ছেদ।) পূর্ব্বে বলিয়াছি, (৪পৃঃ) হীরার সহিত রোহিণীর চরিত্রের কতকটা মিল আছে। এই 'হিংসাটুকু' হীরার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে সেরূপ তীব্র ক্রূর ও নীচ নহে।

'গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী'কে হিংসায় ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আখ্যায়িকা-কার রোহিণীর দোষের কথা সরলভাবে স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ও পাঠকের সমবেদনার উদ্রেক করিতেছেন। 'তা আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এটুকুতে কত হিংসা। রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না। তা, তোমরা রোহিণীর জন্য এক বার আহা বল।'

এইবার রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের সমবেদনা-প্রকাশের চিত্র। 'এতক্ষণ অবলা * একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাহার মনে হইল, যে এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?' ইহা অবশ্য অবিমিশ্র করুণা, এখনও গোবিন্দলালের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, এখনও ইংরেজ কবি-বর্ণিত "I pity you' 'That's a degree to love.' 'Pity melts the mind to love,'—এরূপ অবস্থা নহে, অর্থাৎ 'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা' নহে।

---

* এ 'অবলা' দুর্ব্বলা অর্থে প্রযুক্ত নহে। ইহা চণ্ডীদাসের অবলা = অবোলা। 'বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঁই সে অবলা নাম।'

গোবিন্দলাল 'কুসুমিত লতার অন্তরাল' হইতে রোহিণীকে দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু সে করুণার চক্ষে, দুষ্মন্তের মত প্রেমের চক্ষে নহে। গোবিন্দলাল পুনঃ পুনঃ রোহিণীকে তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরুষের নিকট বলিতে না পারিলে 'বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের' অর্থাৎ গোবিন্দলালের স্ত্রীর মারফত জানাইতে বলিলেন। 'যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না।' ইহার বোধ হয় দুইটি কারণ—(১) হরলালের প্রতি মনোভাব অনেক দিন অপ্রকাশিত থাকিলেও সদ্যোজাত নহে, গোবিন্দলালের প্রতি মনোভাব সদ্যোজাত; (২) উইলের ব্যাপারে রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট অপরাধিনী। (এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ ও পর-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) তাই তাহার কথা ফুটিতেছিল না। যাহা হউক শেষে বলিল "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলাতে রোহিণীর মনোভাবের আভাস পাওয়া গেল। (রোহিণীর ভবিষ্যদ্‌বাণী একদিন সফল হইবে, অতএব এই উক্তির Irony লক্ষণীয়।)

রোহিণীর পূর্ব্বরাগ

এই সপ্তম পরিচ্ছেদে রোহিণীর পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত হইল। গোবিন্দলাল এখনও নির্লিপ্ত। সুতরাং রোহিণীর পূর্ব্বরাগের আভাস দিয়া আখ্যায়িকা-কার শুধু যে 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ' এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, 'স্ত্রিয়া রাগঃ' এ ক্ষেত্রে পুরুষের পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বকালবর্ত্তী। 'এই রোহিণী গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন?' পরে ৯ম পরিচ্ছেদে আখ্যায়িকা-কার এই প্রশ্নের

অবতারণা করিয়া 'জানি না,' 'বলিতে পারি না' স্ত্রীচরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার ভান করিয়াও শেষে তাহার উত্তর দিয়াছেন—'সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি ; সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।' হরলাল সম্প্রতি তাহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের, শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল; তাই 'হঠাৎ' সে গোবিন্দলালকে—'চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে' তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান 'চম্পক-নির্ম্মিত মূর্ত্তি', করুণার সমবেদনার 'দেবমূর্ত্তি' গোবিন্দলালকে হৃদয়ে আসন দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিল। অসময়ে করুণাশীল গোবিন্দলালের প্রতি তাহার (উইল্-সম্বন্ধে) অন্যায়াচরণ স্মরণ করিয়া 'সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত, চম্পকদাম-বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানসচক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।' (৮ম পরিচ্ছেদ।) (হীরার অনিদ্রা তুলনীয়।) কবি এ স্থলে 'দেখিল আর মজিল' ধরণের আসক্তির পরিবর্ত্তে আসক্তির জটিল কারণ-পরম্পরার বিশ্লেষণ করিয়া অভিনবত্বের, মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

'গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর; চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।) *

* 'গভীর জলে ক্ষেপণী-নিক্ষেপে তরঙ্গ উঠিল।' ইন্দিরা, ১১শ পরিচ্ছেদ—তুলনীয়।

রোহিণীর হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

পূর্ব্বে (২পৃঃ) বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনা-স্থলে স্পষ্টাক্ষরে ইহার দোষ-ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন, এবং পাত্রপাত্রী প্রথম হইতেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, তাহাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বের, প্রবৃত্তির ও ধর্ম্মজ্ঞানের সংগ্রামের বিবরণ দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাই তাঁহার ভাষায় 'সুমতি'-'কুমতির' দ্বন্দ্ব, ইউরোপের মধ্যযুগের ধারণায় Strife between the good angel and the evil angel ; ৭ম পরিচ্ছেদের শেষে ইহার আরম্ভ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে ইহার বেগবৃদ্ধি : গোবিন্দলালের 'অসময়ে করুণা' ও রোহিণীর হৃদয়ে অঙ্কুরিত প্রণয়—এই উভয়ের প্রভাবে উইল্ চুরির ব্যাপারে তাঁহার প্রতি 'বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ' ("এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে ?") রোহিণীর মনে বিঁধিতে লাগিল। গোবিন্দলালের প্রতি ন্যায়পরতার সংকল্প ও চেষ্টা তাহার হৃদয়ে প্রবল হইল। কিন্তু উপায় কি ? প্রথম অবস্থায় আত্মহত্যার কথা ('কলসীদড়ি-সহযোগে') মনে হইল। কিন্তু তাহাতে ত গোবিন্দলালের গুরুতর অনিষ্টের প্রতীকার হইবে না। নানা উপায়ের কথা ভাবিয়া শেষে রোহিণী আবার উইল্ চুরি করাই শ্রেয়ঃ কল্প স্থির করিল। কিন্তু 'সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা।' 'হরলালের লোভে' যে সাহস দেখাইয়াছিল এখন গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়ের প্রাবল্যেও সেই সাহস দেখাইয়া সে কার্য্য-উদ্ধারের চেষ্টা করিল, কিন্তু 'অদৃষ্টবশাৎ' ধরা পড়িল।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। ব্যাপার এতদূর গড়াইবার পূর্ব্বে রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয় কেমন বদ্ধ-

মূল হইল তাহার উল্লেখ করিয়াছি (১৭ পৃঃ)। আখ্যায়িকা-কার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন সুমতি কুমতি দুই জনে সন্ধি করিয়া, 'সখ্যভাবে' গোবিন্দ লালের 'দেবমূর্ত্তি রোহিণীর মানস-চক্ষের অগ্রে ধরিল।' এবং বুঝাইয়াছেন 'সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক।' ফলতঃ কুমতিরই 'জয় হইল।' কিন্তু রোহিণী স্রোতে গা ঢালিয়া দিল না। 'রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘৃণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল।' (৯ম পরিচ্ছেদ)। * ইহাতে একদিকে রোহিণীর বর্দ্ধমান প্রণয়কে প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা, অপরদিকে গোবিন্দ-লালের এখন পর্য্যন্ত পাপের প্রতি ঘৃণা ও শুচিতা বুঝা যায়। 'জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রি-দিন মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল.' বটে, কিন্তু মরিতে পারিল না। এ বিষয়ে সে কুন্দের সহিত ('বিষবৃক্ষ' ১৬শ পরিচ্ছেদ) তুলনীয়। কুন্দ যেমন নগেন্দ্রনাথকে দূর হইতে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়া মরিতে পারিল না, রোহিণীও সেইরূপ গোবিন্দলালকে দূর হইতে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়া মরিতে পারিল না। সেই আশায়ই (রজনীর রামসদয় মিত্রের বাটীতে যাওয়ার মত) 'সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন-মধ্যে দেখিতে পায়।'

* হীরার সহিত তুলনীয়। 'বিষবৃক্ষ' ৩০শ পরিচ্ছেদ।—('কার্পাসমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়' ইত্যাদি।)

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—দাম্পত্যপ্রণয়

পূর্ব্বে বলিয়াছি (২পৃঃ) উভয় আখ্যায়িকার প্রধান ব্যাপার দাম্পত্যপ্রণয়, অপ্রধান ব্যাপার বিধবা-ঘটিত অবৈধ প্রণয়। সেই জন্য 'বিষবৃক্ষে' দেখা যায় নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের পূর্ব্বেই (যদিও সূর্য্যমুখীকে আসরে নামান হয় নাই, তথাপি) ১ম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের 'নৌকাযাত্রা'র আরম্ভেই রহিয়াছে—'ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন,...ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত...নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না।' ইহা হইতে বুঝা যায় সূর্য্যমুখী কেমন পতিপ্রাণা এবং নগেন্দ্রনাথও কেমন পত্নীবৎসল। গ্রন্থারম্ভেই এই দাম্পত্য-প্রণয়ের সুর বাঁধা হইল (the key-note is struck)। পরে ৫ম পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর পত্রও এই সুরে ভরপূর। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায়ও গোবিন্দলালের হৃদয়ে রোহিণীর প্রতি প্রণয়সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই (১ম খণ্ডের ১০ম ও ১২শ পরিচ্ছেদে) দুইটি পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের গভীর অনাবিল প্রণয়ের, একাত্মতার, উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উইল্ চুরির সংবাদ পাইয়া 'রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।' 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন।' আবার উভয়েই 'রোহিণীকে বাঁচাইতে' ব্যগ্র। এ সবই উভয়ের একাত্মতার পরিচয়। ইহারও পূর্ব্বে ৭ম পরিচ্ছেদে 'কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল!'—ইহার (symbolism) সঙ্কেত লক্ষ্য করিলেও গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের একান্ত-নির্ভরের 'ধ্বনি' উপলব্ধি করা যায়। ঐ পরিচ্ছেদেই রোহিণীর ভ্রমরের উপর হিংসাও ('মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী'

ইত্যাদি) পরোক্ষভাবে এই গভীর দাম্পত্য প্রণয়ের সাক্ষ্য দেয়। (২১শ পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য। 'তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসা করিত।')

আর একটি কারণে আখ্যায়িকা-কার এই দুইটি পরিচ্ছেদে দাম্পত্য-প্রণয়ের উজ্জ্বল সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণীকে বাঁচাইবার এই চেষ্টার সূত্র হইতেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের প্রণয় শিথিলমূল হইবে, তাই ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্বর্গালোক উজ্জ্বলভাবে পাঠকের হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াসে এই চিত্র অঙ্কিত।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী

এক্ষণে উইল্ চুরির ফল কি হইল তাহার আলোচনা করি। উইল্ চুরির ব্যাপারের সহিত রোহিণীর প্রণয়ের বিকাশ নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ, ইহা আখ্যায়িকা-কারের কলাকৌশলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গোবিন্দ-লাল রোহিণীর উদ্ধারের জন্য 'জ্যেঠা মহাশয়ের' নিকটে উপস্থিত হইলে 'রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ-মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। ...এ কাতর কটাক্ষের অর্থ ভিক্ষা...বিপদ হইতে উদ্ধার। সেই বাপী-তীরে গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাহা জানাইল।' (১১শ পরিচ্ছেদ।)

গোবিন্দলালের হৃদয়ে কেবল দয়া, রোহিণীর 'মঙ্গল সাধি'বার ইচ্ছা; কিন্তু রোহিণীর কটাক্ষে কৃপাভিক্ষা ও কষ্টের ইঙ্গিত ছাড়া আরও কিছু ছিল, ১২শ পরিচ্ছেদে তাহা রোহিণীর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দ-লালের উপকারের জন্য রোহিণী কেন উইল্ বদলাইতে গেল, তাহার উত্তরে সে মনের নিভৃত কোণে যে বেদনা যে নৈরাশ্য লুক্কায়িত ছিল তাহার আভাষ দিল।—"যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা

ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন। ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম।" 'গোবিন্দলাল বুঝিলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগ হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্‌বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।' এবারেও 'Pity melts the mind to love' এই উক্তি সার্থক হইল না। 'মৃত্যুই বোধ হয়' রোহিণীর পক্ষে ভাল ইহা বুঝিয়াও (গ্রন্থকার এখানে নিজের জোবানী কথাটা না বলিলেও বুঝিতে হইবে—কুন্দের বেলায় যেমন তেমনই এক্ষেত্রেও তাঁহার ইহাতে সায় আছে) গোবিন্দলাল তাহাকে দেশত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন—কেন? 'তোমায় আমায় দেখা শুনা না হয়।'

রোহিণীর হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

'রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা হইল।' এখনও তাহার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আপাততঃ প্রস্তাবে সম্মত হইল,—কিন্তু—সে কথা পরে বলিব। বুদ্ধিমতী রোহিণী তখনও বিচারবুদ্ধি হারায় নাই, উভয়ের কলঙ্কের ভয়ে গোবিন্দলালকে ভ্রমরকে ছাড়াইবার জন্য অনুরোধ করিতে নিষেধ করিল, তিনি ভ্রমরের সাহায্যে কার্য্য উদ্ধার করিবেন বলিলেন। 'রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে, কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ হইল।'

অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ইহা একতরফা। গোবিন্দলালের হৃদয়ে কেবল

'দয়ার উচ্ছ্বাস।' গোবিন্দলাল রোহিণীর 'পরীক্ষা'য় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। রোহিণীর প্রণয়ের কথা শুনিয়াও অবিচলিত। ভ্রমরের 'বড় লজ্জা করে' বলিয়া শেষে গোবিন্দলালকেই জ্যেঠা মহাশয়ের দ্বারস্থ হইতে হইল;—'রোহিণীর কথা বলিতে প্রাতে কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?' যাহা হউক, অনেক কষ্টে কার্য্য উদ্ধার হইল। গোবিন্দলাল জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে 'বারুণী পুষ্করিণী-ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন।' এ লজ্জা-সঙ্কোচ স্বাভাবিক, ইহা তাঁহার চিত্তবিকারের লক্ষণ নহে।

রোহিণী দেশত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে মন বাঁধিতে পারিল না। অবস্থা ঠিক কমলমণির সহিত কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে কুন্দের মতই ('বিষবৃক্ষ' ১৪শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদ।) রোহিণী কাঁদিতে বসিল। "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির!—...গোবিন্দলাল রাগ করিবে, করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব।...আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত, যমের বাড়ী যাব।" উইলচুরির ব্যাপারে কলঙ্কের ভয়ও সে করে না। 'এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী আবার—"পতঙ্গবদ্‌বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল।' (তাহার অসংযমের দোষ ঘোষণা করিয়া অমনি আখ্যায়িকা-কার তাহাকে 'কালামুখী' বলিয়াছেন ইহা লক্ষণীয়।)

সে তখনও যুঝিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে 'হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও।

আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।' এইখানে কুন্দের চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ। কোমলপ্রকৃতি কুন্দ সূর্য্যমুখীর অনিষ্টের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার জন্য, জ্বালা-নিবারণের জন্য, সুমতি-লাভের জন্য, এমন ব্যাকুলভাবে জগদীশ্বরের শরণ লয় নাই, সে কুমারী-কাল হইতে নগেন্দ্রের প্রতি প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে দৃঢ়প্রকৃতি (robust-natured) ও স্বার্থান্ধা রোহিণী ভ্রমরের অনিষ্ট হইবে একথা এক-বারও ভাবে নাই; বৌঠাকরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য নিজের কেশ কাটিয়া দিতে চাহিতেছে, ভ্রমরের উপর তাহার অনুরাগ এই পর্য্যন্ত। (অবশ্য কুন্দ যেমন সূর্য্যমুখীর নিকট উপকার পাইয়াছিল, রোহিণী ভ্রমরের নিকট তেমন কোনও উপকার পায় নাই যাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে।) কিন্তু নিজের চরিত্ররক্ষার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে দেবতাকে ডাকিয়াছিল। (হীরার চরিত্রেও দ্বন্দ্বের প্রথম অবস্থায় এই দৃঢ়তা দেখা যায়।)

অবশ্য এত করিয়াও রোহিণী (ও হীরা) মন বাঁধিতে পারে নাই। "তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না। কখনও ভাবিল গরল খাই, কখনও ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই, কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি, কখনও ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।" এতটা প্রবল দ্বন্দ্ব, এতটা আকুলতা, এতটা চাঞ্চল্য, (এতটা "ব্যাপকতাও" বলা যাইতে পারে), কুন্দের প্রকৃতিতে নাই। রোহিণীর প্রকৃতি যেমন সবল, তাহার প্রবৃত্তিও তেমনই প্রবল। কোমল-প্রকৃতি কুন্দের মনে নগেন্দ্রনাথকে

কাণ্ডিয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাওয়ার মত উৎকট চিন্তা আসিতে পারে না। নগেন্দ্রনাথ আসিয়া নূতন করিয়া মোহ বিস্তার না করিলে কুন্দ বোধ হয় ("বিষবৃক্ষ" ১৬শ পরিচ্ছেদ) ডুবিয়াই মরিত। যাক্ সে কথা। রোহিণীর দেশত্যাগে অনিচ্ছার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল "অধোবদন হইলেন"। "রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।" (১৪শ পরিচ্ছেদ।) হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপারে সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দর জীবনতরী এক পথে চলিয়াছিল; আর এক্ষেত্রে রোহিণীর আসক্তির কথা শুনিয়া ভ্রমর তাঁহাকে যে পরামর্শচ্ছলে তিরস্কার করিয়া পাঠাইল, তাহার ফলে রোহিণীর জীবনতরী অন্যপথে চলিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—দাম্পত্যপ্রণয়

রোহিণী চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনা অবশ্য রোহিণীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতি গভীর দয়াবশতঃ। এখনও প্রণয় আসিয়া সেই দয়ার উৎস আবিল করে নাই। তখন ভ্রমর আসিয়া উপস্থিত হইল; ভ্রমরের পূর্ব্ববৎ স্বামীর উপর অটল বিশ্বাস, স্বামী যে তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ভাবিতে পারেন ইহা তাহার বুদ্ধির অগম্য, স্বামী রোহিণীকে ভালবাসেন স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া তখনই 'মিছেকথা' ধরিয়া ফেলিল ও প্রণয়-কলহে কুপিত হইয়া স্বামীর গালে 'ঠোনা মারিল'। গভীর দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রায় শেষ অঙ্কের এই দৃশ্য প্রাণস্পর্শী।

এদিকে ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিলে গোবিন্দলালের বাক্যগুলির— "সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি?" "সিয়াকুলকাঁটা" (রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তুলনীয়) "রোহিণীকে ভাবছিলাম," "আমি রোহিণীকে ভালবাসি" "তোমার

সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি"—Irony লক্ষণীয়। ভ্রমরের কাছে শেষে কথাটা প্রকাশ করিলেন, রোহিণী আমায় ভালবাসে। গোবিন্দলালের এই শেষ ভ্রমরের নিকট অকপটে কোনও কথা না লুকাইয়া প্রকাশ করা। স্বামিসুখগর্ব্বিতা ভ্রমর রাগে, অভিমানে, বালিকাবুদ্ধিবশতঃ রোহিণীকে 'বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে' মরিতে বলিয়া পাঠাইল, কিন্তু ইহাতে অহিত হইবে বুঝিল না। গোবিন্দলালকে বলিল, 'সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে— সে কি মরিতে পারে?' (১৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রমরের এই পরামর্শে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ইহারই ফলে ঘটনাচক্রে রোহিণী গোবিন্দলালকে "কাড়িয়া লইয়া" কৃতার্থ হইল। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্যপ্রণয়ের ইতিহাস-প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু রোহিণীর ব্যাপারের সহিত এই দাম্পত্য প্রণয়ের নিবিড় সংযোগ আছে, সুতরাং ইহার প্রসঙ্গও মধ্যে মধ্যে তুলিতে হইতেছে ও হইবে।

রোহিণীর হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

রোহিণী সত্য সত্যই ভ্রমরের উপদেশ পালন করিল। কুন্দ যাহা পারে নাই, সে তাহা করিল। কুন্দর মত ছেলেমানুষি ভাবে ভাবিল না, 'ফুলিয়া পড়িয়া থাকিব, দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন?' রোহিণীর কলঙ্ক-লাঞ্ছনা (উইলচুরির ব্যাপারে) কুন্দর অননুভূত, রোহিণীর প্রকৃতিও দৃঢ়, তাই সে ইতস্ততঃ না করিয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল। কিন্তু সে মরিয়াও মরিতে পারিল না, গোবিন্দলাল তাহার 'মরণেও প্রতিবাদী' হইলেন। জলতল হইতে মৃতবৎ দেহ উদ্ধার করিয়া নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাকে বাঁচাইলেন।

গোবিন্দলালের শুচিতা

এইখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রোহিণী যখন সন্ধ্যাকালে বারুণী পুষ্করিণীতে আসিল, তখন তাহার জলে নামিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া "দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।" (১৫শ পরিচ্ছেদ।) তখনও পর্য্যন্ত গোবিন্দলালের মন শুদ্ধ, চরিত্রে শুচিতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। জলতলে যখন মগ্নদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল, তখন আখ্যায়িকা-কার শুধু নিজের জোবানী যে তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছেন,—"দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।"—তাহা নহে, গোবিন্দলালকে দিয়াও করাইয়াছেন; কিন্তু তখনও তাহাতে রূপমোহ নাই, কেবল "দয়ার উচ্ছ্বাস।" 'গোবিন্দলালের চক্ষে জল পাড়ল। বলিলেন "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন? দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—'এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।' (ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়েও সমবেদনার উদ্রেক করে।)

রোহিণীকে বাঁচাইবার চেষ্টাকালে প্রথমতঃ গোবিন্দলাল "সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদ হলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে' ইচ্ছা করিলেন না—এখানেও তাঁহার চরিত্রের শুচিতা লক্ষণীয়। উড়িয়া মালী এ কার্য্যে অস্বীকৃত হইলে অগত্যা "গোবিন্দলাল সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।" (১৬শ পরিচ্ছেদ।)
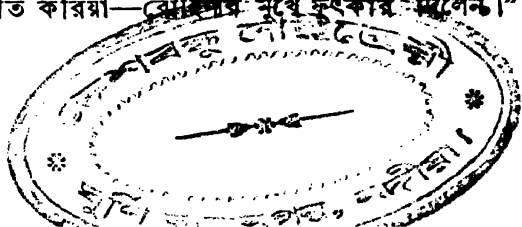
গোবিন্দলালের রূপমোহ

সেই অধরস্পর্শই তাঁহার কাল হইল। (এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ নিষেধ।) সেই মুহূর্ত্ত হইতে রূপমোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। রূপের মদিরার মাদকতা বুঝাইবার জন্যই আখ্যায়িকা-কার এই (১৬শ) পরিচ্ছেদে রোহিণীর দেহের—বিশেষ অধরের এমন মোহকর (sensuous) চিত্র আঁকিয়াছেন।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী-প্রতিমূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা' 'জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে গোবিন্দলাল আসিয়া বসিলেন,' (লজ্জাভূষণা কুলস্ত্রী ভ্রমরের এই অর্দ্ধাবৃতা মূর্ত্তির প্রতি ঘৃণাও লক্ষণীয়)—এই বর্ণনাটুকু বর্ণনামাত্রই নহে, ইহার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য আছে; অর্দ্ধমৃতা অর্দ্ধাবৃতা রোহিণীকে প্রমোদোদ্যানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই এই বর্ণনার সমাবেশে একটা সঙ্কেত (symbolism) আছে:—গোবিন্দলাল চরিত্রবান্ হইলেও তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা সৌন্দর্য্যস্পৃহা সুপ্ত আছে (তাই "সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভাল বাসিতেন"),—রোহিণীর অধরস্পর্শে সেই সুপ্ত স্পৃহা জাগিল। * বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার ভিতর একটা সূক্ষ্মভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, রসগ্রাহী সেইটুকু ধরিতে পারেন। আপাততঃ এই মন্তব্যটি কষ্টকল্পনা বলিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন, কিন্তু আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ১৯শ পরিচ্ছেদের আরম্ভে গ্রন্থকারের উক্তি—'তাঁহার এই পূর্ণযৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গ-তুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই

* ইংরেজী সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠককে Hawthorneএর 'Marble Faun'এর (symbolism) সঙ্কেত স্মরণ করাইয়া দিই।

চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।' পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। 'ঠিক সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল।...... লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।'—এই দুর্লক্ষণের (omen) উল্লেখ করিয়াও আখ্যায়িকা-কার বুঝাইতেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল।

রোহিণীর হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

এইবার রোহিণীর কথা বলিব। 'জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করে নাই।' (১৬শ পরিচ্ছেদ।) (আবার গোবিন্দলালের চরিত্রের শুচিতার ইঙ্গিত।)

রোহিণী তথায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া 'হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ' গোবিন্দলালকে দেখিল, তাঁহার 'মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' এ সুখ তাহার স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু সুখের ভিতরও দুঃখ লুকাইয়া ছিল, এ যে চণ্ডীদাসের 'বিষামৃত।' সে তাহার বিড়ম্বিত জীবন-রক্ষার জন্য গোবিন্দলালকে বড় দুঃখে তিরস্কার করিল,—'আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?' * তীব্র যাতনায় অধীর হইয়া বলিল, "আমি পাপ পুণ্য জানি-না—মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি

* সংস্কৃতভাষায় রচিত 'নাগানন্দ' নাটকে জীমূতবাহন অন্য নারীতে আসক্ত এই ভ্রমবশতঃ লতাপাশে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা মলয়বতীকে জীমূতবাহন নিবারণ করিলে মলয়বতী ঠিক ঐ কথা বলিয়াছিলেন, 'মরণেও তুমি প্রতিবাদী!'

এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয় তুমি রক্ষা করিয়াছ।······* চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।······ রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। † আশাও নাই।" (১৭শ পরিচ্ছেদ।) এই পরিচ্ছেদ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ হইতে বুঝা গেল, রোহিণীর 'মন-তরী' টলমল করিতেছে, গোবিন্দলাল ইহার উপর একটু চাপ দিলেই নৌকাডুবি হইবে। পরের কথা পরে হইবে। আপাততঃ এখনও সে কলঙ্কের, লোকাপবাদের ভয় করে, তাই গোবিন্দলালের সঙ্গ (escort) প্রত্যাখ্যান করিয়া সে একাই গৃহে ফিরিল।

গোবিন্দলালের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

এইখানে গোবিন্দলালের হৃদয়ে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইল। ইহার উৎপত্তি দেখিলাম, এইবার পরিণতি দেখিব।

রোহিণীর অচেতন দেহের শুশ্রূষাকালে তাহার অধরে অধর দিয়া গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন, § সেই মুহূর্ত্ত হইতে রূপমোহ

* 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলা লক্ষণীয়। ৭ম পরিচ্ছেদে 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে' স্মর্ত্তব্য।

† সে জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়াও সে বুঝিবে—'বদনমপূরি ক্ষারবারিভিঃ।' অবৈধ প্রণয়ের ধারাই এই।

§ জলমগ্নার অচেতন দেহে এই উপায়ে জীবন-সঞ্চারের আর একটি ঘটনার শাদাসিধা বর্ণনা নিম্নে একখানি ইংরেজী আখ্যায়িকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'Not too late, perhaps to save her—not too late to try to save her, at least! He placed his lips to hers, and filled her breast with the air from his own panting chest. Again and

তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি তাহা বুঝিলেন, তাই রোহিণী সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিলে গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও, আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" (১৭শ পরিচ্ছেদ।) নগেন্দ্রনাথের ন্যায় গোবিন্দলালও প্রবৃত্তির সহিত প্রাণপণে যুঝিতে আরম্ভ করিলেন, এই আকুল প্রার্থনা তাহারই নিদর্শন। তাহার পর তিনি (হীরার মত) 'মনে মনে স্থির করিলেন যে বিষয়-কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া' (১৯শ পরিচ্ছেদ) তিনি যাচিয়া জমিদারী দেখিতে 'দেহাতে' গেলেন। ইহাও প্রবৃত্তির সহিত যুঝিবার চেষ্টা।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—মনোভঙ্গের সূচনা

পূর্ব্বে বলিয়াছি, (২৬পৃঃ) রোহিণীকে ভ্রমর যে (আত্মহত্যার) পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইল, কেননা তাহারই জের, গোবিন্দলাল রোহিণীর মৃতবৎ দেহে জীবনসঞ্চার করিতে গিয়া রূপমোহে আচ্ছন্ন হইলেন। সেই রাত্রে গৃহে ফিরিয়া তিনি ভ্রমরের পুনঃ পুনঃ

---

again he renewed these efforts, hoping, doubting, despairing—once more hoping, and at last, when he had almost ceased to hope, she gasped, she breathed, she moaned, and rolled her eyes wildly round her—She was born again into this mortal life.—O. W. HOLMES: "*The Guardian Angel,*" *Ch. IX.*

প্রশ্নে রাত্রির ঘটনা বলিলেন না, বলিলেন 'দুই বৎসর পরে বলিব।' (১৮শ পরিচ্ছেদ।) এই তাঁহার ভ্রমরের সহিত প্রথম লুকোচুরি, সত্য-গোপন, একাত্মতার অভাব। ইহারও ফল ভবিষ্যতে বিষময় হইল। এই ছিদ্রে অনর্থ ঘটিল, এই রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিল। ভ্রমর ব্যথিত হইল, 'তার বুকের ভিতর একখানা মেঘ উঠিয়া সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল।' (১৮শ পরিচ্ছেদ।) তখনও পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর উপর বিশ্বাস অটল।

বিরহিণী ভ্রমর

তাহার পর স্বামিবিরহিণী প্রোষিতভর্তৃকা ভ্রমরের শোকের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ক্ষীরি ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সেই রাত্রের ঘটনা—রোহিণীর কথা কুভাবে বুঝিয়া ভ্রমরকে জানাইল। পুরস্কার-স্বরূপ ভ্রমরের কাছে প্রহার খাইয়া ক্ষীরি ঝোঁকের মাথায় রোহিণীর কথা রং দিয়া পাঁচ জনের কাছে বলিল, ক্রমে এই কুৎসিত কথা মুখে মুখে চারিদিকে রটিল, পাড়ার মেয়েরা ভ্রমরকে সমবেদনা (?) জানাইতে দলে-দলে আসিল। ভ্রমর ক্ষীরিকে মারিল, পাঁচীচাঁড়াল্নীর কাছে স্বামীর কুৎসা জানিতে চাহিল না, পাড়ার মেয়েদের ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিল, কিন্তু তখনও স্বামিভক্তিপূর্ণহৃদয়া হইলেও তাহার মনের কোণে এক একবার একটু একটু সন্দেহের ছায়া পড়িল। সে 'উর্দ্ধমুখে সজলনয়নে যুক্তকরে মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?" তাহার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুকায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর

প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবারমাত্র মনে ভাবিলেন, "যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা সহজ মনে করে।' (২০শ পরিচ্ছেদ।) 'ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন! তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে?' (২১শ পরিচ্ছেদ।) সন্দেহের ছায়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—অবিশ্বাস ও অভিমান

প্রথমে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। (২০শ ও ২১শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু এরূপ কলঙ্করটনা ভ্রমরের কায, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমরকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিবার জন্য যখন রোহিণী স্বয়ং আসিয়া গহনা দেখাইয়া গেল (২২শ পরিচ্ছেদ) তখন ভ্রমরের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। সে স্বামীকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখিল (২৩শ পরিচ্ছেদ), স্বামী ফিরিতেছেন সংবাদ পাইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল (২৪শ পরিচ্ছেদ)। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইল। এ সবই সেই রাত্রিতে গোবিন্দলালের সত্য-গোপনের পরিণাম। তিনি যে উদ্দেশ্যে (রোহিণীকে ভুলিতে) বিদেশ-গমন করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু বিদেশগমনের ফল অন্যদিকে বিষময় হইল। 'অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।......এ সময় দুইজনে একত্র থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ হইত। ভ্রমরের

এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রমরের কথা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও পুনঃ পুনঃ তুলিতে হইতেছে, নতুবা গোবিন্দলালের অধঃপতনের সূত্র ধরা যাইবে না।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পড়িয়া 'স্তম্ভিত' হইলেন, ব্রহ্মানন্দের পত্রে 'বিস্মিত' হইলেন—'ভ্রমর দ্বারা এই সব কদর্য্য কথা রটিয়াছে!' (২৩শ পরিচ্ছেদ।) তিনি 'অনুকূল পবনে চালিত হইয়া' বিদেশে গিয়াছিলেন, 'বিষণ্নমনে' গৃহে যাত্রা করিলেন। আসিয়া, ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া 'সকলই বুঝিতে পারিলেন।' মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?" এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) 'গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। আবার চোখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি?' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) এ পর্য্যন্ত মধুর সুন্দর। তিনি রাগ-অভিমান যাহাই করুন, এখনও তিনি ভ্রমর-গতচিত্ত।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী—রূপমোহ

কিন্তু—তাহার পর? 'শেষ দুর্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল

জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না।···গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোহিণীর কথা প্রথম স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল।' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট সেই রাত্রিতে সত্য গোপন করিয়াছিলেন, রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল-রোহিণীর কলঙ্ক রটনা হইলে, এই দুইটি কার্য্যের ফলে, ভ্রমর স্বামীর উপর বিশ্বাস হারাইল, পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ভ্রমরের এই কার্য্যে গোবিন্দলাল অভিমানভরে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলেন। এই কার্য্য-কারণ-পরম্পরা লক্ষণীয়।

গোবিন্দলালের হৃদয়ে যখন প্রবৃত্তি ক্রমেই প্রবল হইতেছে, তখন দৈবগত্যা একটি ঘটনায় ব্যাপার চরমে দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল একদিন সন্ধ্যাকালে বারুণীতটে, উদ্যানমধ্যস্থ মণ্ডপ-মধ্যে বসিয়া 'সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন,' এমন সময় রোহিণী ঘাটে আসিল। গোবিন্দলাল তাহাকে চিনিলেন না, শুধু স্ত্রীলোক বুঝিয়া 'আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে' বলিয়া নিষেধ করিলেন। (বোধ হয় কথাগুলির symbolism অর্থাৎ সঙ্কেত গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।) রোহিণী (কথাগুলি শুনিতে না পাইয়া?) উদ্যানে প্রবেশ করিল, 'সাহস পাইয়া মণ্ডপ-মধ্যে উঠিল।' রোহিণীর আর কলঙ্ক-ভয় নাই, কেননা কুৎসা যথেষ্ট রটিয়াছিল। উভয়েরই এই কুৎসা-রটনা-সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল। রোহিণী বলিল, 'এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?' এ কথার পর গোবিন্দলাল তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। 'সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না।'

(বঙ্কিমচন্দ্রের reticence লক্ষণীয়। হালের কোন কোন্ আখ্যায়িকা-কার এখানে কি কাণ্ড করিতেন, ওয়াকিবহাল পাঠক তাহা অবশ্য জানেন।) 'কেবল এইমাত্র বলিব যে সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।' (২৫শ পরিচ্ছেদ।) দৈব-বিড়ম্বনায় প্রলোভনে পড়িয়া, গোবিন্দলাল সংযমের বন্ধনে হৃদয় আর বাঁধিতে পারিলেন না। 'রূপে মুগ্ধ ? কে কার নয় ?······তাতে দোষ কি ? রূপ ত মোহেরই জন্য হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেননা রূপতৃষ্ণা অনেকদিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে; আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না। একদিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।' (২৬শ পরিচ্ছেদ।) এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের reticence, এবং পাপাচরণের দোষ-ঘোষণা (condemnation) অথচ অধঃপতিত সুচরিত্র নায়কের প্রতি সমবেদনা লক্ষণীয়।

গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতন

রোহিণী গোড়া হইতেই হারের কাত (losing battle) লইয়া জীবনের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে লালসা সুপ্ত ছিল, হরলাল সেই সুপ্ত লালসা জাগরিত করিয়া পরে তাহার আশাভঙ্গ করিল, সেই শূন্যহৃদয় গোবিন্দলাল পূর্ণ করিলেন। স্বামিস্মৃতিবর্জ্জিতা লালসাময়ী বিধবার এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় গোবিন্দলালের তরফ হইতে একটু আস্কারা পাইলেই, শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ

পড়িলেই, শেষরক্ষা অসম্ভব। ঘটিলও তাহাই। গোবিন্দলালের হৃদয় যখন রূপমোহে আচ্ছন্ন, বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত, তখন দৈবযোগে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল, উভয় পক্ষেরই অধঃপতনের আর বিলম্ব হইল না। রোহিণী এখনকার ব্যাপারে একটু বেশী অগ্রসর। ('আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?'……'এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?') তাহার আর কলঙ্কভয় নাই। ('যা বলিবার তা বলিতেছে।') বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের পাপাচরণের দোষ ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন, রোহিণীর অসংযমের নিন্দা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। 'রোহিণী লোক ভাল নয়।' (৭ম পরিচ্ছেদ।) 'রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই।' (২২শ পরিচ্ছেদ।) তিনি যে শুধু প্রতিযোগিনী ভ্রমরের মুখ দিয়া তাহাকে 'আবাগী পোড়ারমুখী বাঁদরী' ও ভ্রমরের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ক্ষীরির মুখ দিয়া 'কালামুখী' বলাইয়াছেন তাহা নহে, নিজের জোবানীও তাহাকে 'রাক্ষসী পিশাচী' (২২শ পরিচ্ছেদ) 'প্রেতিনী' (২৫শ পরিচ্ছেদ) বলিয়াছেন।

অনুতপ্তা ভ্রমর

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল্ আবার নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিল। তিনি গোবিন্দলালের চরিত্রভ্রংশে দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে 'কুপথগামী দেখিয়া চরিত্র-শোধনের জন্য' 'গোবিন্দলালের শাসন-জন্য ভ্রমরকে (গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তে) সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিয়া গেলেন। ইহাতে গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি আরও অভিমান হইল। 'কৃষ্ণ-কান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিলে প্রথমে শোকে স্বামি-স্ত্রীর একাত্মতা হইল, আপাততঃ রোহিণীর কথা উঠিল না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা কালো পরদা পড়িয়া গেল। (২৭শ পরিচ্ছেদের শেষ অংশের প্রাণস্পর্শী বিবরণ

দ্রষ্টব্য।) 'গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য, ভাবিত রোহিণী।' স্বামিস্ত্রীর এই (alienation oi heart) মনোভঙ্গের রন্ধ্র দিয়াই অবৈধ প্রণয় দিন দিন গোবিন্দলালের হৃদয়ে সুপরিসর স্থান করিয়া লইতে লাগিল।

তাহার পর গোবিন্দলাল ভ্রমরকে মনের অভিমান জানাইলেন, ভ্রমর 'অসময়ে পিত্রালয়ে' যাওয়ার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল, 'কেবল তোমায় জানি তাই রাগ করিয়াছিলাম' এই প্রাণের ব্যথা জানাইল, কিন্তু গোবিন্দ-লাল তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। কেন? 'গোবিন্দলাল তখন ভাবিতে-ছিল "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তাহার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।"……গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 'তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।' (২৮শ পরিচ্ছেদ।) পর-পরিচ্ছেদে আখ্যায়িকা-কার এই আসল কারণটা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বচ্ছলে সরস ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। 'আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না। এতকাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে? এতকাল রোহিণী জোটে নাই।……গোল্লায় যাও। সেই চেষ্টায় আছি। রোহিণী সঙ্গে যাবে কি?' (২৯শ পরিচ্ছেদ।) এখানেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলালের কার্য্যের দোষ-ঘোষণা (condemnation) লক্ষণীয়।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—মনোভঙ্গ

ভ্রমরের অভিমান, গোবিন্দলালের অভিমান, কৃষ্ণকান্ত রায়ের অভিমান (উইল্-বদল-ব্যাপারে) এই তিনে মিলিয়া কি অনিষ্ট ঘটাইল

তাহা আমরা দেখিলাম (যদিও 'আসল কথা রোহিণী'।) আবার গোবিন্দলালের মাতার অভিমান এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইল। তিনি পুত্রবধূর উপর অভিমান করিয়া কাশীযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ ও দেশত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। ভ্রমর 'মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি কতকটা ভ্রান্তচিত্ত' জ্যেষ্ঠ-শ্বশুরের 'অবিধেয় কার্য্যে'র প্রতিবিধান করিয়া স্বামীর রাগ-অভিমান দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীর নামে দানপত্র রেজিষ্টারি করিল, গোবিন্দলাল তবুও তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, শক্ত শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিলেন, 'ধর্ম্ম নাই কি?' ভ্রমরের এই কঠোর প্রশ্নে 'বুঝি আমার তাও নাই' বলিয়া উত্তর দিলেন। ভ্রমর বলিল, "আবার আসিবে······আবার আমার জন্য কাঁদিবে।······তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" (৩০শ পরিচ্ছেদ।) ইহার সত্যতা উপসংহারে উপলব্ধ হইবে। আপাততঃ 'গোবিন্দলাল চোখ মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি···পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।' ভ্রমরকে ক্ষমা করিতে 'অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা···হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয়, একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়-মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।' * (৩১শ

* রূপমুগ্ধ গোবিন্দলালের অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত, রূপলোলুপ সুন্দরের 'দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক' স্মরণ করাইয়া দেয়। রোহিণী রোহিণী-তারার মতই 'তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, রূপতরঙ্গিণী,' তাই রোহিণী নামকরণ।

পরিচ্ছেদ।) আবার সেই 'আসল কথা রোহিণী।' এখন নব-অনুরাগ বা রূপমোহ দাম্পত্য-প্রীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

আখ্যায়িকার দুই খণ্ড

গ্রন্থের এই সন্ধিস্থলে ভ্রমরের সহিত বন্ধনচ্ছেদন হইল, সংযমের শেষ গ্রন্থি শিথিল হইল, রূপমোহ গোবিন্দলালকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিল, তাই এইখানে ১ম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে দেশত্যাগী ও পত্নীত্যাগী গোবিন্দলালের তথা দেশত্যাগিনী ও কুলত্যাগিনী রোহিণীর পূর্ণ অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত। প্রথম খণ্ডে ৩১টি পরিচ্ছেদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী রোহিণী-সংক্রান্ত, আরও ২।৪টিতে রোহিণী ও ভ্রমর উভয়েরই প্রসঙ্গ আছে, তবে প্রধানতঃ ভ্রমরের। প্রথম খণ্ডে রোহিণী-গোবিন্দলালের অবৈধ প্রণয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিবৃত, সুতরাং রোহিণীর কথা অধিক স্থান যুড়িয়া আছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে, অযথাও নহে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫টি (পরিশিষ্ট লইয়া ১৬টি) পরিচ্ছেদের মধ্যে ৭টি মাত্র পরিচ্ছেদে রোহিণীর ইতিহাস আছে।

পাপের চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের সংযম (reticence)

আমরা পরে দেখিব, এই অধঃপতনের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিয়াছেন, 'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।' (২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।) তিনি তাহাদের ব্যভিচারের ফলাও বর্ণনা করেন নাই। ইহা তাঁহার reticenceএর নিদর্শন (৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। হালের কোনও কোনও আখ্যায়িকা-কার প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যভিচার-জীবনের রোজনামচা

পাঠক-পাঠিকার নিকট দাখিল করিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত তুলনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র সুরুচি ও সন্নীতির মর্য্যাদারক্ষায় কতটা যত্নশীল তাহা বুঝা যায়।

গোবিন্দলাল-রোহিণী অনেকদিন ধরিয়া প্রবৃত্তির সহিত যুঝিয়া শেষে যখন স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, ভিতরের ও বাহিরের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মিলিত হইলেন, তখনও তাঁহাদের সুখভোগ-কাল অত্যল্প পরিমাণ। ২য় খণ্ডের ১ম• পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, গোবিন্দলাল মাতার সহিত কাশীযাত্রা করার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পর তাঁহার মাতা পর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাইলেন না, 'বাবুর অজ্ঞাতবাস' আরম্ভ হইল। অবশ্য রোহিণী তখন তাঁহার সহিত মিলিয়াছে। 'এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল।' তাহার কিছুদিন পরে ভ্রমরের পিতার ও পিতৃবন্ধুর বুদ্ধি-কৌশলে রোহিণী গোবিন্দলালের হস্তে নিহত হইল। ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, প্রায় দুই বৎসর হইল গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দেখেন নাই। ইহার প্রথম ছয় মাস রোহিণী তাহার সহিত মিলিত হয় নাই। ফলতঃ রোহিণীর সুখের স্বপন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দর বিধবাবিবাহের অতি অল্পদিন পরেই নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। হীরাও দেবেন্দ্রের সঙ্গ অতি অল্পদিন সম্ভোগ করিয়াছিল। অতএব উভয় আখ্যায়িকা হইতেই বুঝা গেল, পাপাচারজনিত সুখের দিন দীর্ঘকাল-স্থায়ী নহে, অচিরেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বা শাস্তি পাইতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষ-ভাবে এই সৎশিক্ষা দিতে প্রয়াসী।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। গোবিন্দলাল-রোহিণীর নিরুদ্দেশ হইবার বৃত্তান্ত আখ্যায়িকা-কার ঠিক নিজে হইতে বর্ণনা

করেন নাই, ভ্রমর 'গোপনে সর্ব্বদা সংবাদ' লইয়া জানিল—এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার পর ভ্রমরের দশা দেখিয়া তাহার পিতা গোবিন্দলাল-রোহিণীর উপর জাতক্রোধ হইয়া সেই 'পামর-পামরী কোথায় আছে' তাহার সন্ধান লইতে ও সন্ধান পাইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই সূত্রে আমরা উহাদিগের মিলন-বৃত্তান্ত জানিতে পারি। ফলতঃ এই বৃত্তান্ত ভ্রমরের যন্ত্রণার * ইতিহাসের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত, তাহার যন্ত্রণানিবারণের জন্য অনুসন্ধানের ফলে পাঠকবর্গের গোচরে আনীত। এই জন্যই পূর্ব্বে (২পৃঃ) বলিয়াছি, আখ্যায়িকাদ্বয়ের প্রধান আখ্যান-বস্তু দাম্পত্যপ্রণয়, অপ্রধান আখ্যান-বস্তু অবৈধ প্রণয়।

এই খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইতে জানা গেল, রোহিণী রোগের ভান করিয়া শয্যা লইল, পরে 'তারকেশ্বরে হত্যা' দিবার ছলে 'একাই' দেশত্যাগ করিল। অনুমান হয় (স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই) এ ব্যাপারে গোবিন্দলালের সহিত তাহার ষড়যন্ত্র ছিল। এদিকে গোবিন্দলালের সংবাদও 'পাঁচ ছয় মাস পরে আর পাওয়া গেল না, রোহিণীও আর ফিরিল না।' 'ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না।' এক্ষেত্রে আখ্যায়িকা-কার স্পষ্টবাক্যে কিছুই বলিলেন না, ভ্রমরের সন্দেহ হইতে অনুমানের ভার পাঠকের উপর দিলেন। ইহাও reticence এর পরিচায়ক। 'পামর-পামরী' যে পাপাচারের উদ্দেশে গোপনে দূরদেশে

* ভ্রমরের দুঃখযামিনীর সহচরী জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী, ইহাই 'যামিনী' নামের সার্থকতা। যামিনীর ভগিনী-স্নেহের আলোচনা 'কাব্যসুধা' পুস্তকে 'বোনে বোনে' পরিচ্ছেদে (৪৭-৪৯, ৫৪—৬১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

গেল, ইহা মন্দের ভাল। রোহিণীর 'হত্যা' দিবার ছলটুকু—Hypocrisy is the tribute that Vice pays to Virtue!

তাহার পর (২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে) ভ্রমরের পিতা ও তাঁহার আত্মীয় নিশাকর দাসের প্রসাদে প্রসাদপুরের প্রাসাদে পদার্পণ করিয়া আমরা অনেক দিন পরে প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ লাভ করি। কিন্তু এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র 'কপোত-কপোতী'র প্রেম সম্ভাষণের (billing and cooing of doves) চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, যুবতী রোহিণী ওস্তাদের শিক্ষায় সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, 'যুবাপুরুষ' গোবিন্দলাল 'নবেল * পড়িতেছেন, এবং যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন' এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। (প্রেমিক-প্রেমিকা 'সে একা আর আমি একা' নহেন, তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত।) ইহাও বঙ্কিমচন্দ্রের reticence এর, সুরুচির, নিদর্শন।

'নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর ও তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে।' এই বর্ণনার 'ধ্বনি' টুকু (suggestion) প্রণিধানযোগ্য। গোবিন্দলালও 'নিঃশঙ্কে পাপাচরণ

---

* নবেল্ পড়া সময় কাটাইবার জন্য। 'যুবাপুরুষ' 'যুবতীর কার্য্য দেখিতেছিল', 'নিবিষ্টচিত্তে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে', অথচ 'নবেল পড়িতেছেন'—ইহা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণায় ভাটা পড়িয়াছে, এখন আর তিনি অনিমেষ-লোচনে রোহিণীর রূপসুধা পান করিতেছেন না; তিনি loveও জানিয়াছেন, 'love's sad satiety'ও জানিয়াছেন। তাই রোহিণীর একটা নূতন আকর্ষণী শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ওস্তাদ রাখিয়া তাহাকে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী করিতেছেন। ভ্রমরের উপর অভিমানের বেলায় যেমন বর্ণিত আছে—'আগে কথা কুলাইতনা, এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়' (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ), এখন বোধ হয় রোহিণীর বেলায়ও

করিবার' জন্য এই স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও 'সত্বর ধ্বংস-পুরে প্রয়াণ' করিবে, তিনি অচিরে ভ্রমরের নিকট গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থের ভিখারী হইবেন। গৃহসজ্জার বিবরণে দেখা যায়—'কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু, কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত, অবর্ণনীয়।' এগুলি সেই বারুণী পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের 'অর্দ্ধাবৃতা স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি'র (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ) পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত (?) সংস্করণ! তখনকার সুপ্ত রূপ-তৃষ্ণা জাগরিত হইয়া এখন এই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবতীর 'চঞ্চল কটাক্ষের মাধুর্য্যে' এখন গোবিন্দলাল মসগুল। কিরূপ সাবধানতার সহিত আখ্যায়িকা-কার 'যবনিকা পতন' করিয়াছেন, তাহা এই বিষয়ের আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই পরিচ্ছেদ-সম্বন্ধে আর একটু মন্তব্য আছে। নিশাকরের প্রবেশ-মাত্র 'রোহিণীর তবলা বেসুরা বাজিল, ওস্তাদজির তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।' ইহার সঙ্কেত (symbolism) লক্ষণীয়। নিশাকরের কারসাজিতেই অচিরে প্রমোদ-গৃহের সুখের হাট ভাঙ্গিবে, রোহিণী-গোবিন্দলালের জীবনের ঐকতান-বাদন বেসুরা হইয়া যাইবে, এমন কি রোহিণীর জীবনের তার ছিঁড়িবে, ইহা তাহারই সূচনা।

সেইরূপ হইয়াছে। আর ঐ অবস্থায়, এ আবহাওয়ায় (atmosphere) নবেল পড়াই সঙ্গত; তবে সব নবেলেই দূষিত রুচি নাই। ('কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' এই নিষেধ-বাক্য-সম্বন্ধে মল্লিনাথের টীকা 'অসৎকাব্যবিষয়তাঞ্চ পশ্যন্' ইত্যাদি স্মর্ত্তব্য)। চরিত্রবান্ ইংরেজ কবি গ্রে (Gray) যে গিদ্দায় ঠেস দিয়া নিত্য নূতন নবেল্ পড়াই জীবনের সেরা সুখ মনে করিতেন। ('to lie on a sofa and read eternal new romances.') বঙ্কিমচন্দ্র ইহা না বুঝিলে নিজে নবেল্ লিখিতেন না।

রোহিণীর পূর্ণ অধঃপতন ও তাহার পরিণাম

'অপরিচিত যুবাপুরুষ' সুবেশ 'সুপুরুষ' নিশাকর * ওরফে রাস-বিহারীকে ফুলবাগানে বেড়াইতে দেখিয়া রোহিণী ভাবিতেছিল, "বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড়মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোক ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! ...ওর-সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।" 'রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কিনা তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এমন কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।' (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) আবার নিশাকর 'বড় হলে' বসিলে 'পাশের কামরা' হইতে রোহিণীর 'পটল-চেরা চোক তাঁকে দেখিতেছিল।' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) অনেকদিন পূর্ব্বে রোহিণী গোবিন্দলালকে পুষ্পোদ্যানে দেখিয়া রূপতৃষ্ণায়, লালসায় দগ্ধ হইয়াছিল। আবার ফুলবাগানে নূতন মানুষকে দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইল। পূর্ব্বের মত মনের বল নাই, সুতরাং প্রলোভনে পড়িতে বিলম্ব হইল না। তবে লালসা তত তীব্র নহে। কেননা তখনকার মত হৃদয় একেবারে শূন্য নহে, পরন্তু বহুদিন ধরিয়া আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হইয়াছে (তথাপি 'মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি'। এ আবার নূতন লালসা!)

* নিশাকর কি রোহিণী-তারার হৃদয় চন্দ্র আর রাসবিহারী নাকি কি কৃষ্ণলীলার দ্যোতক?
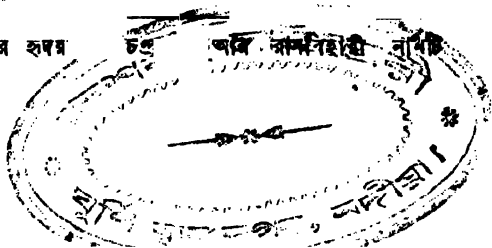
রোহিণী উপযাচিকা হইয়া খুড়ার সংবাদ লইবার অছিলায় বাবুটির সহিত নিভৃতে দেখা করিতে চাহিল, অপর পক্ষও সাহ্লাদে সম্মত হইল। নদীর ধারে, বাঁধা ঘাটের কাছে বকুলতলায় দেখা করার বন্দোবস্ত হইল। (ভারতচন্দ্রের সরোবরের ধারে বকুলতলা স্মর্ত্তব্য।) 'এখন রোহিণীর মনের ভাব কি; তাহা আমরা বলিতে পারি না।...বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচা-আঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটল-চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" * ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী তাহাকে জয় করিতে কামনা না করিবে?... রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই? জানিনা এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল?' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) ফলকথা, রোহিণীর লালসাবহ্নি চিরতরে নিভিবার আগে আর একবার জ্বলিল। ইহা হইতে বুঝা যায় তাহার চরিত্রের কত দূর অধঃপতন হইয়াছিল। আখ্যায়িকা-কার ঠিকই বলিয়াছেন, 'যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।' (১ম খণ্ড ২৬শ পরিচ্ছেদ।) পাপাচারের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আখ্যায়িকাকার ভ্রমরের পিতার জোবানী

---

* We may say that regarded him somewhat as a sportsman does a pheasant :—*Anthony Trollope : Barchester Towers*, ch 38.

'পামরী', নিশাকরের জোবানী 'পাপীয়সী', চাকরের জোবানী 'হারামজাদা' ও নিজের জোবানী 'মহাপাপিষ্ঠা' 'পাপীয়সী' বলিয়া রোহিণী-চরিত্রের দোষ-ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন, ইহাও লক্ষণীয়।

নিভৃতে সাক্ষাৎকালে রোহিণী অপরিচিত পুরুষকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল; "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।" (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।)—এই বলিয়া আপ্যায়িত করিল; আরও কতদূর গড়াইত কে জানে? এমন সময় গোবিন্দলাল অকুস্থলে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর যে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিল, তাহার আর বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু দেখাইব যে, 'যেদিন অনায়াসে অক্লেশে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই।' ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব,—সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা।" ...রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!" (২য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।) এখানেও দেখা গেল, ভোগ-লালসা 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বর্দ্ধিত হইয়াছে, অপিচ পূর্ব্বের সে কলঙ্কভয় এবং সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব অনেক দিনই লোপ পাইয়াছে। দেখা গেল, অধঃপতন কতদূর হইয়াছে। পাপের শাস্তিও ভীষণ। রোহিণীর ভাগ্যে হীরার মত শুধু 'পদাঘাত'ই ঘটিল না, 'বিশ্বাসহন্ত্রী' প্রণয়ীর হস্তে নিহত হইল।

রোহিণী-হত্যা

বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাপাপিষ্ঠার' মহাপাপের উপযুক্ত কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া সন্নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ; আপাত-মনোরম পাপের বিষম পরিণাম জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, কাব্যকলার নিয়মে poetic justiceএর ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি 'বালক-নখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর' মৃতদেহের উল্লেখ করিয়া পাঠকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডের 'নিমিত্ত-মাত্র' নিশাকরের মুখ দিয়া ক্রটি স্বীকার (apology) করাইয়াছেন।—"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য।...কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়! রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব ; পাপ-স্রোতের রোধ করিব ; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার দিবার আমি কে?...বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।)

গোবিন্দলালের পূর্ণ অধঃপতন ও রোহিণী-হত্যা

রোহিণীর চরিত্রের আলোচনা যথেষ্টই হইয়াছে। এক্ষণে পত্নীত্যাগী ব্যভিচারী তথা নারী-ঘাতক গোবিন্দলালের পাপের ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের বা শাস্তির আলোচনা করা যাউক।

গোবিন্দলালেরও পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে। একটি সামান্য কথায়

আখ্যায়িকা-কার তাহা সূচিত করিয়াছেন। প্রসাদপুরের কুঠিতে ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া গোবিন্দলালের স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, 'যে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়।' (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু তাঁহার চরিত্রে একটি redeeming feature রহিয়াছে। ১ম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি, ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার সময়ও গোবিন্দলাল ভ্রমরের 'অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে' তাহা ভুলেন নাই। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না।' এখন ২য় খণ্ডে দেখিতেছি, নিশাকর ওরফে রাসবিহারীর মুখে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দলাল 'অন্যমনস্ক' 'কথা কহিলেন না',...'কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক! অনেক দিন পরে ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল।' (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) নিশাকর উঠিয়া গেলে গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে গাইতে বলিলেন, বাজাইতে গেলেন, 'সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল।' * গীত বন্ধ করিয়া সেতার বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 'কিন্তু গৎ সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।' নবেল্ পড়িতে গেলেন, 'অর্থবোধ হইল না'; "আমি এখন একটু ঘুমাইব।...কেহ যেন উঠায় না," চাকরকে এই আদেশ দিয়া 'শয়নগৃহ-মধ্যে গেলেন।' (ঐ পরিচ্ছেদ।) ঘুমাইবার কথা ছল-মাত্র; বুঝা গেল তাঁহার মন কতটা আলোড়িত হইয়াছে। রোহিণীর রূপবারিধিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি ভ্রমরকে ভুলিতে পারেন নাই। "দ্বাররুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া দুই হাত

---

* সেই জন্যই ৫ম পরিচ্ছেদের শেষ অংশের (symbolism) সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে বলিয়াছি (৪৪পৃঃ)।

মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুই-ই। আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই।...কান্না বৈ ত আর উপায় নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে কাঁদাইলেন, নিজেও সমবেদনায় কাঁদেন নাই কি? তাঁহার কথায়ই বলি—'অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।' (১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) 'আমরা কেবল কাঁদিতে পারি।' (১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছেদ।)

'বিশ্বাসহন্ত্রী' রোহিণীর সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া করিবার সময় তিনি রোহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি, রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, * যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম।" (২য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।) অনুতাপের তুষানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। †

* নগেন্দ্রনাথের উক্তি তুলনীয়। 'আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ।......আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।' (বিষবৃক্ষ, ৪৮শ পরিচ্ছেদ।)

'হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।'
'দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে।
*
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ।'

(ভবভূতি, উত্তররামচরিত।)

এই জন্যই আখ্যায়িকা-কার বলিয়াছেন (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ) —'রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে।...নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন।... সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্গীর্ণ হইবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয় সুধা...দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, —তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথা এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।' এই ভাবে দেখিলে বুঝিব গোবিন্দলালের রোহিণী-হত্যা তীব্র আত্মধিক্কার ও অনুশোচনার অপ্রতিবিধেয় পরিণাম; ইহা নারীহত্যা নহে, নিজের পাপাচারের, কলঙ্কিত জীবনের সমূলে সংহার, তথা স্বকৃত পাপাচরণের স্বাভাবিক পরিণতি।* ভ্রমর সতীত্বগর্ব্বে ঠিকই বলিয়াছিল, 'তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' (১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছেদ।) সেই জন্যই বলিয়াছি, দাম্পত্যপ্রণয় আখ্যায়িকার প্রধান [illegible] প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু (২পৃঃ)।

* ইহাতেও যদি কেহ নায়ককে নারীঘাতক করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে নিন্দা করেন, তাঁহাকে জবাব দিব, স্বয়ং শেক্‌স্পীয়ার্ নায়ক ওথেলোকে নারীঘাতক করিয়াছেন, অথচ ডেস্‌ডেমোনা ত নিষ্পাপা ছিলেন সুতরাং ওথেলোর অপরাধ গুরুতর। (অবশ্য উভয় খুনের ব্যাপারে ও চরিত্রদ্বয়ে বিস্তর প্রভেদ আছে।)

রোহিণীর বেলায় বলিয়াছি (৪৭পৃঃ), তাহার ভোগ-লালসা 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার 'নবীন বয়স, নূতন সুখ।' সে মরিতে চাহে না। আখ্যায়িকা-কার বলিয়াছেন, 'যেদিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই; সুতরাং সে সাহসও নাই।' গোবিন্দলালেরও অনুরূপ অধঃপতন হইয়াছে। ভোগলালসা বাড়িয়াছে, প্রাণের মায়া হইয়াছে। একদিন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' (১ম খণ্ড ২৮শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু খুনী আসামী হইয়া গোবিন্দলাল প্রাণ ও তদপেক্ষাও প্রিয় মান বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমরকে জানাইবার জন্য দেওয়ানকে লিখিলেন, 'আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়-সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয় এই ভিক্ষা।' (২য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।) ফাঁসি যাওয়ার চরম অপমান হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি ভ্রমরের নিকট নীচু হইবার অপমান স্বীকার করিলেন। আবার অব্যাহতি পাইবার পর তিনি লজ্জায় (ও অভিমানে) ভ্রমরের পিতার সহিত, অনুরুদ্ধ হইয়াও, দেখা করিলেন না, ভ্রমরের সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু দারিদ্র্যে পড়িয়া শরীরধারণের জন্য ভ্রমরকে পত্র লিখিয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন; ভ্রমর কঠোর উত্তর দিলে অম্লানবদনে অর্থভিক্ষা করিলেন, 'পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি', 'যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।' (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।) দেখা গেল, সকল দিকেই তাঁহার কতদূর অধঃপতন হইয়াছে।

এই ত গেল, বাহিরের কথা ('the external life of the bodily machine' *)।

গোবিন্দলালের অনুতাপ

ভিতরে-ভিতরে অনুতাপের, আত্মগ্লানির তুষানল ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-ব্যাপী বিবরণে যেমন ভ্রমরের অসহ্য যন্ত্রণার, উৎকট রোগের মর্ম্মভেদী ইতিহাস আছে, তেমনি 'অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ পুটপাক-প্রতীকাশঃ' গোবিন্দলালেরও আত্মগ্লানির, অনুশোচনার মর্ম্মভেদী ইতিহাস আছে। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও তাঁহার 'দোষ গুরুতর ; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।' 'যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান', তখনও গোবিন্দলালের হৃদয় ভ্রমরময়, 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে' ; তখনও তিনি মনে-প্রাণে 'ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে' ক্ষমাভিক্ষার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু 'কতকটা অহঙ্কার……কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড, কতকটা ভয়—পাপ সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না—তাঁহাকে বাধা দিল। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই।……তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশাভরসা ফুরাইল।'……'কিন্তু তবু সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমর-দর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দগ্ধ করিতে লাগিল। গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

* এই সুন্দর ভাবদ্যোতক বাক্যাংশটুকু Mark Pattison এর Life of Miltonএ (p.2) পাইয়াছি।

তাহার পর, গোবিন্দলাল যখন 'পেটের দায়ে' ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন, তখন 'পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন', অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি নিজেকে 'পামর' বলিয়াছেন, পত্রের ছত্রে ছত্রে আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল' ইত্যাদি। (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।)

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর—পুনর্ম্মেলন

তাহার পর, ভ্রমরের যখন দিন ফুরাইয়া আসিল, তখন গোবিন্দলাল সংবাদ পাইয়া একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য আসিলেন, ভ্রমরের প্রার্থনায় সাহস পাইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। 'নিঃশব্দপদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।* দুজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না···গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিলেন।···গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল।' (২য় খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।) আর এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিব না। কেবল গ্রন্থকারের কথায় আবার বলিব, 'গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

---

* ভ্রমরের ভবিষ্যদ্-বাণী, সতীর বাক্য ফলিল। 'মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে।······যদি আমি সতী হই, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব।' ইত্যাদি। (১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছেদ।)

গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত (১ম সংস্করণে)

'সে রাত্রি' গোবিন্দলালের 'বড় ভয়ানকই গিয়াছিল।' রাত্রি-প্রভাতে 'মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।' হেমচন্দ্রের ভাষায় 'দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।' তাহার পর অসহ্য শোকাভিভূত তীব্র-অনুতাপদগ্ধ গোবিন্দলাল অনেক বেলা পর্য্যন্ত গৃহসংলগ্ন (জঙ্গলে পরিণত) পুষ্পোদ্যানে ও বারুণীপুষ্করিণী-তটের হৃতশ্রী পুষ্পোদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।* ভ্রমর ও রোহিণীকে ভাবিতে ভাবিতে 'প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়।' 'জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।' গোবিন্দলাল সমস্ত দিন ধরিয়া সেই 'ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে' রহিলেন। 'সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই, চৈতন্য নাই।' শেষে তাঁহার 'উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল।' তিনি শুনিলেন, 'রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে, "এইখানে এমনি সময়ে আমি ডুবিয়াছিলাম।......ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"' গোবিন্দলাল তখন 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে' সাত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে সময়ে রোহিণী ডুবিয়াছিল, সেই-খানে সেই সময়ে সেই বারুণী পুষ্করিণীর জলে অবতরণ করিয়া ডুবিলেন। 'পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ

* 'একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন।' অনুমান হয়, ইহা সেই 'শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি।' (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) রূপতৃষ্ণার প্রতীক সেই প্রস্তরমূর্ত্তি এখন ভগ্ন। (২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) রূপতৃষ্ণার অবসানসূচক এই (symbolism) সঙ্কেত লক্ষণীয়।

পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত (সংশোধিত সংস্করণে)

বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে পত্নীদ্রোহী ব্যভিচারী নারীঘাতক গোবিন্দলালের কঠোর প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছিলেন। আমরা যখন যৌবনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম, তখন নায়কের এইরূপ শোচনীয় জীবনাবসানের সহিতই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার্ যেমন শেষ নাটকগুলির রচনাকালে একটা wise toleranceএর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ পরে অধিকতর বিজ্ঞতা লাভ করিয়া অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা দেখাইয়া সংশোধিত সংস্করণে মহাপাপী গোবিন্দলালের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

রোহিণীর আহ্বান-শ্রবণে 'তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত···হইলেন। মূর্চ্ছাবস্থায়, মানসচক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণী-মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি * সম্মুখে উদিত হইল। ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিও না। ······আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" গোবিন্দলাল মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন।' পরে চিকিৎসায় ২।৩ মাসে প্রকৃতিস্থ হইয়া 'একরাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) পরি-

* 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে জলে ডুবিলেন'—১ম সংস্করণের উপসংহার। 'জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি' রোহিণীর প্রভাব পরাজিত করিল—সংশোধিত সংস্করণের উপসংহার; উভয়ত্রই ভ্রমরের প্রাধান্য, দাম্পত্য-প্রেমের জয়; তবে এখনকার উপসংহারে ইহা বেশী সুস্পষ্ট। (কালো ভ্রমর এখন জ্যোতির্ম্ময়ী ইহাও লক্ষণীয়।)

শিষ্টে জানা যায়, 'ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে' গোবিন্দলাল সন্ন্যাসি-বেশে একবার ফিরিয়াছিলেন এবং ভাগিনেয় শচীকান্তকে বলিয়াছিলেন, "ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।······ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" তাহার পরে আবার তিনি প্রব্রজিত হইলেন। 'Calm of mind, all passion spent.' 'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্···স শান্তিমধিগচ্ছতি।'

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর শিক্ষা

'বিষবৃক্ষ'-বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে যাহা বলিয়াছি, এই প্রবন্ধের উপসংহারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—'ইহা হইতে কি সম্পূর্ণ-রূপে সপ্রমাণ হয় না যে তরলমতি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অবৈধ প্রণয়ের তীব্র উত্তেজনা-উন্মাদনার উদ্রেক করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নহে, অসংযমের বিষময় পরিণাম প্রদর্শন করিয়া মোহের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য?' নগেন্দ্র-কুন্দর, দেবেন্দ্র-হীরার, গোবিন্দলাল-রোহিণীর গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি—সর্ব্বত্রই এই নিবৃত্তির শিক্ষা, প্রবৃত্তির প্ররোচনা নহে।

শেষ কথা

আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি 'অপরাধ' প্রতীয়মান হয়। ১ম, অতৃপ্তবাসনা লালসাময়ী যুবতী বিধবাকে কেন্দ্র করিয়া অবৈধ প্রণয়-কাহিনী রচনা করা। পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি (২পৃঃ), বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাকে কেন্দ্র

করেন নাই, দাম্পত্যপ্রণয়ই উভয় আখ্যায়িকায় তাঁহার প্রধান আখ্যানবস্তু, বিধবাঘটিত অবৈধ প্রণয় অপ্রধান আখ্যানবস্তু।

আর তাঁহার এই শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য দায়ী—তৎকালীন বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলন।

[এই দুইটা কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। ষাট বৎসরের অধিক কাল দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে করুণা-পরবশ হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে বৈধ বিবাহ, গভর্ণমেণ্টের নিকট বহু গণ্যমান্য হিন্দুর স্বাক্ষরিত আবেদন করিয়া এই মর্ম্মে আইন করিয়া লইয়াছিলেন। এই আন্দোলনের শাস্ত্রীয় বিচারের দিক্‌টা বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহ্য, pure reasonএর ব্যাপার; তদ্‌বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের কোন বক্তব্য নাই, কেননা তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার মত শাস্ত্রজ্ঞান এই অনভিজ্ঞ লেখকের নাই; বর্ত্তমান আলোচনা-ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা প্রাসঙ্গিকতাও নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের অন্য একটা দিক্ আছে। সেটা হৃদয়বৃত্তি অর্থাৎ sentimentএর ব্যাপার। বস্তুতঃ উক্ত আন্দোলনের ভিত্তিই sentimentএর উপর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি—'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির হৃদয় পাষাণময় হইয়া যায়।...দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়।'—ভাবপ্রবণ কবিহৃদয়ে এক নূতন তরঙ্গ, নূতন আবেগ সৃষ্টি করিল। কবিকুল সমাজ-সংস্কারকের উদ্ধৃত উক্তির প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, পতির মরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিধবার সব সাধ ফুরায় না, সব আশা মেটে না; বিশেষতঃ যাহাদিগের যৌবনের প্রবৃত্তি অতৃপ্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের সেই প্রবৃত্তি-

দমন হয় না, সেই লালসার নিবৃত্তি হয় না। এমন কি, মৃত পতির স্মৃতিও তাহাদিগের হৃদয়কে সরস ও শান্ত রাখে না? এই ভাবভাবিত হইয়া তাঁহারা বিধবাকে লালসাময়ী-রূপে চিত্রিত করিলেন এবং লালসার চক্ষে বিধবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।......

সম-সাময়িক শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা-কার বঙ্কিমচন্দ্রও এই আন্দোলনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি 'বিষবৃক্ষে' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিধবার প্রেমতৃষ্ণার, ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র অঙ্কিত করিলেন, যুবতী বিধবাকে প্রেমিকা বা কামুকী-রূপে চিত্রিত করিলেন। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'বিষবৃক্ষে'র বীজ এই বিদ্যাসাগর মহাশয়-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আন্দোলনে নিহিত রহিয়াছে। ফল কথা, এই আন্দোলনের প্রভাবে সহৃদয় কবিগণ যুবতী বিধবাদিগের প্রতি করুণা ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না। এই শ্রেণীর অতৃপ্তবাসনা উদ্ভিন্নযৌবনা লালসাময়ী বিধবাকে কাব্যের প্রেমিকা নায়িকা-রূপে কল্পনা করিলেন। বিধবাদিগের পরপুরুষে প্রণয় কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রণয়প্রবণ যুবকের পক্ষে এইরূপ নায়িকা নিতান্ত লোভনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। *কবি হেমচন্দ্র খোলসা বলিয়াই দিলেন,—'বঙ্গের বিধবা সম কোথা পা'ব ললনা?' It became a veritable goldfield for our novelists, dramatists, lyrists.

[কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র মনস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলেও একেবারে স্রোতে গা ঢালিয়া দেন নাই।

* দ্বারবন্ধনীর (৫৮-৫৯ পৃঃ) অন্তর্নিবিষ্ট অংশ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধ (চৈত্র ১৩২৭) হইতে গৃহীত।

তিনি স্বীয় প্রতিভা-বলে নূতন পথ লইয়াছেন, অতৃপ্তবাসনা বিধবার প্রতি যথেষ্ট করুণা ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াও দুর্নীতির সমর্থন করেন নাই, এবং 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উভয়ত্রই বঙ্কিমচন্দ্র যুবতী বিধবাকে আখ্যায়িকার নায়িকা বা প্রধানা পাত্রী করেন নাই, প্রতিনায়িকা বা অপ্রধানা পাত্রী করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ দত্তের ধর্ম্মপত্নী সূর্য্যমুখী ও গোবিন্দলাল রায়ের ধর্ম্মপত্নী ভ্রমর আখ্যায়িকাদ্বয়ের নায়িকা, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী প্রতিনায়িকা। অবৈধ প্রণয় আখ্যায়িকার অন্তর্নিবিষ্ট একটা করুণ (episode) ফ্যাংড়া-মাত্র, মূল আখ্যান (main plot) নহে। কুন্দ-রোহিণীর প্রণয়-ব্যাপার ও নিদারুণ পরিণাম পাঠকহৃদয়ে গভীর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে (এরূপ না হইলে কাব্যকলার ক্রটি হইত, আর্টের দোষ হইত), কিন্তু সূর্য্যমুখী ভ্রমরের যন্ত্রণার ইতিহাস তদপেক্ষাও গভীরতর করুণা ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দাম্পত্য-প্রণয়ের জয়গানই আখ্যায়িকা-কারের প্রকৃত হৃদ্গত ভাব, পরকীয়া-প্রেম নায়কদ্বয়ের জীবনে একটা দুর্গ্রহ কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কাল পূর্ণ হইলে গ্রহদোষ কাটিয়াছে, উপসর্গের উপশম হইয়াছে, ছায়া সরিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের মোহের অবস্থায়ও সূর্য্যমুখী অন্তরে,' কুন্দনন্দিনী বাহিরে ; গোবিন্দলালের মোহের অবস্থায়ও 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' পরকীয়া-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব দিবেন না বলিয়াই তিনি বিবাহিত পুরুষকে এই প্রেমের মহাজন করিয়াছেন, নতুবা আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, অমরনাথের মত অকৃতদার ব্যক্তিকে বা শচীন্দ্রনাথের মত বিপত্নীক ব্যক্তিকে বিধবার প্রেমিক ও পাণিপ্রার্থী করিলেই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত হইত। ('মৃণালিনী'তে পশুপতি অজ্ঞাতসারে 'in love with his own wife' !) অন্যান্য লেখকদিগের বহু আখ্যায়িকায়

অবিবাহিত পুরুষকে যুবতী বিধবার প্রেমিক করা হইয়াছে, প্রেমময়ী যুবতী বিধবাকে গল্পের নায়িকা করা হইয়াছে, এইগুলির প্রভেদ-দৃষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা উপলব্ধ হয়। তাঁহার ঝোঁক (bias) বিধবার প্রণয়-লীলার অনুকূলে কি প্রতিকূলে, তাহাও ধরিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু পরোক্ষভাবেই নিজের ঝোঁকের আভাস দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, বহু স্থলে বহু ভাবে, কোথাও কোথাও স্পষ্টবাক্যে, এই অবৈধ প্রণয়ের, এই পরকীয়া-প্রীতির, এই অসংযমের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষ' নামকরণেই ত এই (condemnation) দোষ-প্রদর্শনের, নিন্দার ভাব স্ফুটীকৃত। তিনি কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আকর্ষণকে, তথা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণকে 'রূপজ মোহ', 'চোখের ভালবাসা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (শেক্স্‌পীয়ারের 'Fancy engendered in the eyes'), প্রগাঢ় প্রণয় নহে। ('বিষবৃক্ষের' ৩২শ পরিচ্ছেদে হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহার দ্রষ্টব্য)। 'বিষবৃক্ষে' একাধিক স্থলে, কখন কখন সমগ্র একটী পরিচ্ছেদে (যথা ২৯শ) তিনি এই অসংযমের প্রবৃত্তিপ্রবণতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী অনেক লেখকের এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় লেখকের পূর্ণ সংবেদনা ও ঝোঁক বিধবার প্রণয়-লীলার দিকে, ইহা বেশ বুঝা যায়।

তৃতীয়তঃ, নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর, গোবিন্দলাল-রোহিণীর হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইবামাত্র তাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, 'পবিত্র প্রেমে'র আবির্ভাবে কৃতার্থম্মন্য হইলেন, এবং ইহাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়া লইলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাবে তাঁহাদিগের চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। প্রত্যুত, তাঁহারা এই আসক্তির সহিত প্রাণপণে বুঝিয়াছেন, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, শেষে তাঁহারা প্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন,

বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা হইতেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ও তাঁহার কাব্যকলার উৎকর্ষ বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ, এই অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট (reticence) সংযম-সঙ্কোচের পরিচয় দিয়াছেন, সর্ব্বত্র ইঙ্গিতে সারিয়াছেন, কোথাও বর্ণনার আতিশয্য নাই, পাপের আভাস-মাত্র দিয়া যবনিকা-ক্ষেপণ করিয়াছেন। হালের কতকগুলি অবৈধ-প্রণয়ের বর্ণনাত্মক আখ্যানে যেরূপ চুম্বন-আলিঙ্গনের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তাহার সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি কত শুচি ছিল, কত সংযত ও শিষ্টাচার-সম্মত ছিল।

পঞ্চমতঃ, যে আখ্যায়িকা-দ্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার অসংযমের, আদর্শ-চ্যুতির, অবৈধ প্রণয়ের, পরপুরুষে প্রসক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, সে দুই খানিতেই তিনি বিপথগামিনী বিধবার প্রণয়-লীলার শোচনীয় পরিণাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিফল, মর্ম্মভেদী ভাবে ঘটাইয়াছেন, করুণায়, সমবেদনায়, তাঁহার হৃদয় (পাঠকের মতই) কাঁদিয়াছে, কিন্তু তিনি ধর্ম্মের ও নীতির তুলাদণ্ড দৃঢ়হস্তে ধরিয়া অসংযমের কঠোর শাস্তি-বিধান করিয়াছেন, কুন্দর আত্মহত্যা ও রোহিণীর গোবিন্দলালের হস্তে মৃত্যু স্মরণীয়। ইহাই আধুনিক প্রতীচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের poetic justice ; ইহাই প্রাচীন প্রতীচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের catharsis ('to purge the mind with pity and terror'—Aristotle); ইহাই কাব্যের সৎশিক্ষা।]* তিনি স্পষ্টবাক্যে এই অবৈধ ব্যাপারের দোষ-ঘোষণা (condemnation) করিয়াছেন ও ইহার বিষময় পরিণাম উজ্জ্বল মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার বিশিষ্টতা, মৌলিকতা, শুচিতা ও সন্নীতিপরায়ণতা।

* দ্বারবন্ধনীর (৫৯-৬২ পৃঃ) অন্তর্নিবিষ্ট অংশ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধ (ভাদ্র ১৩২৮) হইতে গৃহীত।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় 'অপরাধ'—তিনি প্রবৃত্তি-তাড়িতা, প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিতা, যুবতী বিধবার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার পার্শ্বে—অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক—সংযমশীলা প্রলোভন-বিজয়িনী যুবতী বিধবার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। ইহার জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলন দায়ী। এই আন্দোলনের নেতা ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ যুবতী বিধবার কথার উপরই জোর দিয়াছেন (অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য), সমাজে সাধুশীলা সংযতচরিত্রা যুবতী বিধবারও যে অভাব নাই এ কথার উপর জোর দেন নাই। আর এক কথা। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় কাব্যের এই তত্ত্বটুকুকে আকার দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন যে অন্বয়মুখে (direct method) অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে পবিত্র চরিত্রের চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা ব্যতিরেক-মুখে (indirect method) অর্থাৎ পরোক্ষভাবে অপবিত্র চরিত্রের শোচনীয় পরিণাম-বর্ণনায় কাব্যের উদ্দেশ্য ('উপদেশযুজে') সমধিক পরিমাণে সিদ্ধ হয়, যেমন উপদেশাত্মক (didactic) সাহিত্য অপেক্ষা বিদ্রূপাত্মক (satiric) সাহিত্য অনাচার-দমনে বেশী ফলোপধায়ক হয়। তবে ইহাই অবশ্য কাব্যতত্ত্বের শেষ কথা নহে। পবিত্র আদর্শ সৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়া, হৃদয়ে দেবভাবের উদ্রেক করা ও অনুপ্রাণনা দেওয়া, কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (function) কার্য্য। বিধবার আদর্শ-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পবিত্র আদর্শ সৃষ্টি না করাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ত্রুটি তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী আখ্যায়িকা-কারগণ কয়েকটি চরিত্র-চিত্রে সংশোধন করিয়াছেন; যুবতী বিধবা বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, বা কামুকের অবৈধ প্রস্তাব পদদলিত করিয়া, প্রলোভন জয় করিয়া, কোনও কোনও স্থলে

প্রণয়ীর চরিত্র পর্য্যন্ত সংশোধন (reform) করিয়া পবিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, এইরূপ বিধবা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে, ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'খুড়ী মা'আখ্যায়িকায় চঞ্চলার, ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'শরৎচন্দ্র' আখ্যায়িকায় নীরদার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকে শান্তর, ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' আখ্যায়িকায় বিন্ধ্যবাসিনীর, ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুলে' সুষমার, শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে উমার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'অনুপমা'য় অনুপমার এবং last not least—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহে' মৃণালের * নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে পারি। †

* মৃণালের বিষয়ে অপর একটী প্রবন্ধে ('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২৭) প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

† এই শ্রেণীর আরও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র এই প্রবন্ধ-প্রকাশের পরে অঙ্কিত হইয়াছে। বিস্তৃতি-ভয়ে এই পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধে সেগুলির উল্লেখ করিলাম না। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা 'ভারতবর্ষে' 'বিধবা'-শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে (ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র ১৩২৭ ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ, ফাল্গুন ১৩২৮ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) আলোচনা করিয়াছি।

পরিশিষ্ট

ভ্রমর

আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর ১ম খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে ভ্রমরের প্রথম দর্শন পাই। 'গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী,......তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।' তবে কালো হইলেও গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় সেই কালোরূপে শ্রী ছিল। ('সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির,' 'তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের,' 'তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে' ইত্যাদি। আবার ১৪শ পরিচ্ছেদে 'প্রফুল্ল নীলোৎপলদলতুল্য মাধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল।') বোধ হয়, মহাভারতের কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) রূপের সহিতই ইহা তুলনীয়। ('Black, but such as in esteem' &c—**Milton:** *Il Penseroso.*) গোবিন্দলাল আদর করিয়া তাহাকে শুধু ভ্রমর ও ভোমরা নহে, 'কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক কালিন্দী, কালীয়ে' বলিয়া 'নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রসপূর্ণ, সুখপূর্ণ প্রিয়সম্বোধন' করিলেও (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ) সে নয়ান বৌএর মত 'কালপেঁচা,' বা 'কালীর বোতল' ছিল না। কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, 'কে চাহে রে প্রজাপতি পেলে হেন ভ্রমরী?' 'কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী।' গোবিন্দলাল এই কালোরূপে মুগ্ধ, 'অপরাজিতাতে পদ্মের আদর' (১ম খণ্ড ২১শ পরিচ্ছেদ)। কেননা তাহার রূপের অভাব গুণে পূর্ণ করিয়াছিল। ('মল্লিকার সৌরভ,' ১ম খণ্ড ২১শ পরি-

চ্ছেদ।) তাই তাহার 'হাসি' 'চাহনি' দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত "এত গুণ" 'ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত।' (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ।) 'তাই এত ভালবাসি, মেঘেতে বিজলি হাসি।' (ইতি হেমচন্দ্র।)

আর ভ্রমরও 'যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না।' (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ।) 'আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। * আমি এই নয় বৎসর আর কিছু জানি না। কেবল তোমাকে জানি।' (১ম খণ্ড ২৮শ পরিচ্ছেদ।)

ফলতঃ উভয়ের প্রগাঢ় প্রণয়, নিবিড় একাত্মতা, সরস দাম্পত্যলীলা, পরিপূর্ণ দাম্পত্যসুখ, অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা ১ম খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে ভ্রমরের প্রথম দর্শন পাই। কিন্তু সে একা নহে, স্বামীর সহিত যুগলে। এই যুগলে দর্শন দেওয়াইয়া গ্রন্থকার তাহাদিগের দাম্পত্যবন্ধনের নিবিড়তা, দাম্পত্য-প্রণয়ের গভীরতা অনাবিলতা বুঝাইতে চাহেন। গোবিন্দলাল-ছাড়া ভ্রমর যেন 'কায়শূন্য ছায়া, অথবা সংখ্যাতত্ত্বে শূন্যস্থানীয়া! গোবিন্দলাল

*ভ্রমর সূর্য্যমুখী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, বরং এ অংশে সে কুন্দর সহিত তুলনীয়া। কুন্দর মতই সে বালিকা, সরলা, লজ্জাশীলা, কোমলপ্রকৃতি, তবে অতটা অল্পভাষিণী নহে। বয়স ও স্বভাবে সাগর বৌএর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী। উভয়েই বালিকা-স্বভাবা। তাহার বয়সের ও স্বভাবের জন্য চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না সে কথাও আমরা ১ম খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদে জানিয়াছি। এখানেও কুন্দর সহিত (তথা সাগর বৌএর সহিত) তাহার মিল এবং সূর্য্যমুখীর সহিত অমিল।

বাতায়ন-সমীপে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে ভ্রমর তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাও নিবিড়বন্ধনের পরিচয়, যেন এখনও গাঁটছড়া বাঁধা, যেন এখনও ফুলশয্যার রাত্রি। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত দাম্পত্যলীলা, কৃত্রিম প্রণয়কলহ, নথ নাড়িতে 'বিশেষ আপত্তি,' 'মৃদু মৃদু হাসি,' সরস কথোপকথন, উভয়ের মুখপানে উভয়ের 'অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি,' সকলই এই নিবিড়তার পরিচয়, সব এক সুরে সুরবাঁধা। গোবিন্দলালের কথায় ব্যবহারে বুঝা যায় যে তিনি পত্নীপ্রেমে মসগুল, আর ভ্রমরের কথায় ব্যবহারে বুঝা যায় যে সেও স্বামিপ্রেমে ভরপূর, এবঞ্চ স্বামিসৌভাগ্য অর্থাৎ পতিপ্রেমলাভে কৃতার্থা। দাম্পত্যজীবনের সুখ-সূর্য্যালোকের এই দিনের চিত্র ১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দাম্পত্যজীবনের সুখ-সূর্য্যের অবসানের বিবরণের পাশাপাশি রাখিলে ইহা আরও গভীর-ভাবে আমাদের হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়।

১০ম পরিচ্ছেদের শেষ অংশে দৃষ্ট হয় যে রোহিণী চুরি করিয়াছে ভ্রমরের ইহা বিশ্বাস হইতেছে না। কেন না গোবিন্দলালের ইহাতে বিশ্বাস হইতেছে না। 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।' 'গোবিন্দ-লাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন।' ইহা হইতে স্বামিস্ত্রীর একাত্মতা বুঝা যায়। ইহাই ত প্রকৃত বিবাহ, 'স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরেকত্ব-সম্পাদনং বিবাহঃ।' 'যদেকং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।' (কপালকুণ্ডলার সহিত কতদূর প্রভেদ!) বাল্যবিবাহ-তরুর ইহাই অমৃতফল।

গোবিন্দলাল এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 'ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।' এই লজ্জা বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ। আর কেহ তথায় উপস্থিত নাই, তথাপি খুলিয়া বলিতে পারিল না, অথচ পূর্ব্ব কথোপকথন হইতে দেখা গিয়াছে, সে কুন্দর মত

অল্পভাষিণী নহে; ইহাতে বুঝা যায় যে তাহার এই লজ্জা মজ্জাগত। 'লাজে অবনতমুখী তনুখানি আবরি' (হেমচন্দ্র)।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইতে চলিলেন ভ্রমর বুঝিল, ইহাও সেই একাত্মতার পরিচয়। ভ্রমর কোমলহৃদয়া পরদুঃখকাতরা, শুধু স্বামিপ্রেমে ডুবিয়া থাকিয়া অন্যের দুঃখ বুঝে না এমন নহে, এই ব্যাপার হইতে ইহাও বুঝা গেল।

১ম খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল যখন নির্জ্জনে রোহিণীর সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব করিয়া 'আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়' বলিলে 'ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল।' ইত্যাদি। (সাগর বৌএর সহিত তুলনীয়।) আবার ভ্রমর রোহিণী-সম্বন্ধে 'শ্বশুরকে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি!' (১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।) সর্ব্বত্রই এই সুন্দর লজ্জাশীলতা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে স্বামীর উপর তাহার অবিচলিত বিশ্বাস, স্বামিপ্রেমে তাহার একান্ত-নির্ভর, রোহিণী-সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় না। পরের ঘটনাবলির তুলনায় ইহাও বড় সুন্দর। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস, নিজেকে স্বামীর সমগ্র হৃদয়ের অধিকারিণী জানিয়া গর্ব্ব, এই পরিচ্ছেদে শুধু ইঙ্গিতে বুঝিতে হয়, পর-পরিচ্ছেদে ইহা পরিস্ফুট। গোবিন্দলাল 'রোহিণীকে ভালবাসি,' বলিলে সে তখনই 'মিছে কথা' ধরিয়া ফেলিল, সেই বিশ্বাস ও গর্ব্বের জোরে। সমগ্র কথাবার্ত্তায়, গালে ঠোনা মারায়, বুঝা যায় যে, সে নিজেকে স্বামীর

* গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানে 'পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালা-মুখী বলিয়া গালি দিত' ইত্যাদি (১ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ) হইতেও তাহার লজ্জা ও শুচিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আদরের আদরিণী জানিয়া আনন্দে গদ্‌গদ। গোবিন্দলালেরও সব কথা প্রকাশ করিয়া বলায় বুঝা যায় যে তখনও তাঁহার মন নিষ্পাপ, তাঁহার হৃদয়ে ভ্রমর 'সর্ব্বে সর্ব্বময়ী'। রোহিণীর ব্যাপার শুনিয়া তাহার উপর ভ্রমরের রাগ, তাহাকে মরিতে বলিয়া পাঠান, ইহাও সেই স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বের অন্যভাবে বিকাশ। 'যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে, সে কি মরিতে পারে?' একথাতেও তাহার স্বামিভক্তির, স্বামীর রূপগুণের উপর শ্রদ্ধাপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মাধুর্য্য ভবিষ্যতের অবিশ্বাস ও তজ্জনিত মনোভঙ্গের জন্যই আরও স্বাদু, আরও মনোজ্ঞ।

ভ্রমর যখন শুনিল যে গোবিন্দলাল 'দেহাতে' যাইবেন (কারণ অবশ্য তাহার অজ্ঞাত), তখন 'সে ধরিল, আমিও যাইব, কাঁদাকাটি হাঁটা-হাঁটি পড়িয়া গেল।' (১৯শ পরিচ্ছেদ।) স্বামীর অত্যধিক আদরে ভ্রমর কতটা 'আব্‌দারে' হইয়া পড়িয়াছে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হয়ত ইহা হইতে তাহার পরিচয় পান, কিন্তু ইহাও তাহার প্রণয়ের গভীরতার, স্বামীর সহিত একাত্মতার, স্বামীর উপর একান্ত-নির্ভরের পরিচয়। এ সেই আর্য্যনারী সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-চিন্তার ধারা—'ছায়েবানুগামিনী।' শাশুড়ী বাধা দেওয়ায় ভ্রমর যে সব কাণ্ড করিল, তাহাতে ছেলেমানুষি আব্‌-দারের ভাব যথেষ্ট আছে স্বীকার করি (সে যে বালিকা-স্বভাবা), কিন্তু তাহাও সেই গভীর প্রণয়ের পরিচয়। (বস্ত্র মলিন, চুল অপরিষ্কার, ২০শ পরিচ্ছেদ, 'প্রোষিতে মলিনা কৃশা,' 'ন প্রোষিতে তু সংস্কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া দেয়।) (২০শ পরিচ্ছেদে) ক্ষীরির মুখে স্বামীর অপবাদ শুনিয়া ক্ষীরিকে প্রহার ও পরে নিজের কান্নাতেও তাহার ছেলেমানুষির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীর উপর বিশ্বাসের নির্ভরের পরিচয়ও পরিস্ফুট। 'তখনও তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না,—যেখানে আত্ম-প্রতা-

রণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না।' আবার পর-পরিচ্ছেদে তাহার প্রতিবেশিনী নারী-দিগের সহিত ব্যবহারেও এই উভয়ের পরিচয়। (ছেলেমানুষি—বিনোদিনীর ছেলে কাঁদান, পুত্তলের মুণ্ড মোচড়ান; আবার স্বামীর উপর বিশ্বাসের জোরেই সে সুরধুনীকে কঠোর বিদ্রূপ করিতে পারিল।)

কিন্তু এইবার দশচক্রের প্রভাবে তাহার মনের কোণে একটু সন্দেহের ছায়া উকিঝুকি মারিতে লাগিল, যদিও সে ঐ সন্দেহকে আমল দিতে চাহিল না। 'ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহ-ভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস!...... আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে?" কিন্তু এই সন্দেহের ভিতরেও বিশ্বাসের সুর প্রবল। আর সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যও তাহার স্বামীকে স্মরণ ও স্বামীর শরণ-গ্রহণ। উভয় পরিচ্ছেদের শেষেই দেখি, তাহার মরিতে ইচ্ছা হইতেছে। 'এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়?' বাস্তবিক, সন্দেহের উদয় হইলে প্রণয়ে সুখ নাই, জীবনে সুখ নাই। তখন 'যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।'

ভ্রমরের প্রণয়-আকাশে এই প্রথম সন্দেহ-মেঘের উদয়। তাহার প্রণয়-চন্দ্রে এই প্রথম সন্দেহ-রাহুর স্পর্শ। জীবনের সুখসৌভাগ্যালোকে এই প্রথম ছায়াপাত, তাই সেই প্রেমময়জীবিতার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার প্রতিবেশিনীদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন, 'কাহার মনে হইল না, যে ভ্রমর পতিবিরহ-বিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।'

ভ্রমরের মনের এক কোণে যে সন্দেহ প্রথমে দেখা দিয়াছিল (২০শ

পরিচ্ছেদ) 'সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন?'), রোহিণী যখন স্বয়ং আসিয়া নিজ মুখে একরার করিল, (২২শ পরিচ্ছেদ) তখন সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল, সরলা বালিকা রোহিণীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইল। এই অবিশ্বাসের ফল দারুণ অভিমান। ইহা স্বামিপ্রেমেরই অন্য ভাবে বিকাশ। যেখানে যত প্রেম সেখানে তত অভিমান। এই অভিমান-ভরেই সে স্বামীকে অমন কঠিন পত্র লিখিল। 'তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমায় বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে তাহা নহে। যত-দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখও নাই।' (২৩শ পরিচ্ছেদ।) কোমলে কি কঠোরতা থাকিতে পারে, তাহা দেখিলাম। পরে আরও দেখিব (২য় খণ্ডে)। গোবিন্দলাল আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল (২৪শ পরিচ্ছেদ; ২৩শ পরিচ্ছেদের পত্রে সে কথা বলিয়াও ছিল)।

ইহা পদাবলী-সাহিত্যের 'দুর্জ্জয় মান' নহে, ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু সূর্য্যমুখীও এত শীঘ্র অধৈর্য্য হন নাই, স্বামীকে অন্যানিরত দেখিয়া অনেক সহ্য করিয়া শেষে কুন্দর সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া তবে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; ফলতঃ সূর্য্যমুখী গোড়া হইতেই এত কঠিন হন নাই। কমল-মণি সূর্য্যমুখীকে যে কথা বলিয়াছিল, 'তোমার হৃদয়ের আধখান এখনও আমিতে ভরা', সে কথা ভ্রমর-সম্বন্ধেও বেশ খাটে। যেখানে গভীর প্রণয়, সেখানে এ অভিমান থাকেই। 'আমি আর কিছু জানি না· কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।' (২৮শ পরিচ্ছেদ।)

তথাপি যেন মনে হয়, বিলাতী সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্যের পরোক্ষপ্রভাবে আমাদের মধ্যে এখন ব্যক্তিতন্ত্রতা (individualism) প্রবল হইতেছে, সুতরাং আমাদের সাহিত্যে (ও সমাজে) সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের উদ্ভব হইতেছে। এখন 'লক্ষহীরা' গল্পের আদর্শপত্নী চাহিলে সহজে মিলিবে না। ভ্রমরের বেলায় গোবিন্দলাল-প্রদত্ত শিক্ষাও বোধ হয় ইহার জন্য কতকটা দায়ী। 'দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। এক-মাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিতা বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না।' (৩০শ পরিচ্ছেদ।)

যাহাহউক, ভ্রমরের 'অপরাধ' স্বামী অবিশ্বাসের যোগ্য না হইতেই তাঁহার উপর অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ফলে অভিমান ও তাহার ফলে কঠোর ব্যবহার (পত্র ও পিতৃগৃহগমন)। এই 'অপরাধে'র পরিণাম আখ্যায়িকার পরবর্ত্তী অংশে দেখিব। ২৩শ পরিচ্ছেদে ভ্রমর-চরিত্রের পরিবর্ত্তন আরম্ভ। এই হইতেই স্বামিস্ত্রীর মনোভঙ্গের সূচনা।

ভ্রমরের আচরণে গোবিন্দলালের নিজেকে নিষ্পাপ জানিয়া অভিমান, সেই অভিমান-ভরে ভ্রমরের প্রতি কঠোরতা, ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টায় রোহিণী-চিন্তা ও তাহার ফলে মোহবৃদ্ধি (২৪শ ও ২৫শ পরিচ্ছেদ), রোহিণীর জলমজ্জন-রূপ দৈবঘটনা (২৫শ পরিচ্ছেদ), কৃষ্ণ-কান্ত রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু ও চরম উইল্ (২৬শ পরিচ্ছদ) ইত্যাদি ব্যাপারে এই মনোভঙ্গের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল (the breach becomes widened)—অবশ্য গোবিন্দলালের দিক্ হইতে।

উভয়ের হৃদয়েই কিন্তু অকৃত্রিম গভীর প্রণয় ও অভিমানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব প্রথম হইতেই চলিতে লাগিল। কোমলে-কঠোরে একটা সঙ্ঘর্ষ হইতে লাগিল। ভ্রমরের প্রণয়ের, নিজ দোষের জন্য অনুতাপের কোমলতার বিকাশ তাহার বারে বারে যমকে ডাকায়,

মৃত্যুপ্রার্থনায় (২০শ ও ২১শ তথা ২৭শ এই তিনটি পরিচ্ছেদেরই শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য), পিতার পরামর্শে দানপত্র লিখিয়া দেওয়ায় (২৮শ ও ৩০শ পরিচ্ছেদ), আর তাহার অজস্র নয়নাশ্রুতে (১৮শ, ২০শ, ২১শ, ২৭শ, ২৮শ, ৩০শ, ৩১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-প্রার্থনায় (২৮শ ও ৩০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আর তাহার কঠোরতা ও কোমলতার দ্বন্দ্বও পরিস্ফুট—'ভ্রমর অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল' (২৭শ পরিচ্ছেদ), 'ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল' (২৮শ পরিচ্ছেদ), 'ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া', 'তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা,' 'বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল' (৩০শ পরিচ্ছেদ)। অভিমানের কঠোরতার মধ্যেও গভীর প্রণয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় ভ্রমরের গোবিন্দলালকে বিদায় দেওয়ার সময়ের শেষ কথা—"যদি আমি সতী হই ……তুমি আমারই; রোহিণীর নও।" এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভরে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া' ইত্যাদি।

সূর্য্যমুখীর মাতৃভাবের কোনও পরিচয় 'বিষবৃক্ষে' পাওয়া যায় না। কিন্তু ভ্রমরের বেলায় ইহার সামান্য একটু পরিচয় একটি স্থলে পাওয়া যায়। (৩১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) ইহাও উভয় চরিত্রের একটি প্রভেদ। এসম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।* শ্বাশুড়ী ও স্বামীর পরিত্যক্তা ভ্রমরের হৃদয়ের কোমলতার ইহা আর এক ভাবে বিকাশ।

* 'ভারতবর্ষে' 'মা'-শীর্ষক প্রবন্ধাবলির মধ্যে শ্রাবণ ১৩২২ অর্থাৎ ৩য় বর্ষের ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় ইহার আলোচনা করিয়াছি (২৮১—৮২ পৃঃ)।

দ্বিতীয় খণ্ডেও, এই কোমলে-কঠোরে, প্রণয় ও অভিমানের দ্বন্দ্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র না লেখায় 'অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না।' অথচ স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য তাহার আকুল আগ্রহ। 'ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত……সংবাদ পাইলেই বাঁচি।' 'ভ্রমর রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন।' 'অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।' তাহার পর কখনও পিত্রালয়ে, কখনও স্বামিপরিত্যক্ত গৃহে রুগ্ন-শয্যাশায়িনী ভ্রমরের জীবন কাঁদিতে কাঁদিতে, কাটিতে লাগিল। স্বামীর স্নেহহীন ব্যবহার তাহার কতদূর মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল তাহা এই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ায় স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং ইহা হইতেই তাহার পতিপ্রেম ও পতিভক্তির পরিমাপ করা যায়।

তাহার পর এই খণ্ডের ১১শ পরিচ্ছেদে দেখি, গোবিন্দলালকে রোহিণী-হত্যাকারী জানিয়াও ভ্রমরের ইচ্ছা গোবিন্দলাল 'হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন, বিষয় দখল করুন'; পরে যামিনীর কাছে সব কথা শুনিয়া তাহার প্রার্থনা, 'যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।' আবার কঠোরতাও আছে। গোবিন্দলাল যদি আসেন, তবে তাহা তাহার 'বিপদের দিন।' 'গোবিন্দ-লাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছেনা।' অথচ ভ্রমরের 'মর্ম্মান্তিক রোদন' তাহার গভীর প্রণয়ের নিদর্শন। সেই কোমলে কঠোরে দ্বন্দ্ব।

এই খণ্ডের ১২শ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছেন শুনিয়া ভ্রমর তখনই পিতাকে আনাইয়া তাঁহাকে ৫০ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর। দেখিও, আমি আত্মহত্যা না করি।" প্রণয়ের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই।

পর-পরিচ্ছেদে যখন পিতা 'আসিয়া সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে কিন্তু বাড়ী আসিল না' তখন ভ্রমর 'পিতার অসাক্ষাতে অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল বলিতে পারিনা।' অথচ এত কোমলতার মধ্যেও গোবিন্দলালের অর্থভিক্ষার জন্য পত্র পাইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেও পত্রোত্তরে কি কঠোরতা—স্বামীকে পাঠ লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত—'কি ভয়ানক পত্র। এত টুকু কোমলতাও নাই।' 'আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।' প্রত্যেক ছত্রে অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পত্রেও সেই অভিমান, 'আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না। আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।' অথচ সেই অভিমানের তলায় তলায় কতখানি প্রণয় লুক্কায়িত আছে, তাই 'বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্রধারা মুছিতে মুছিতে ভ্রমর গোবিন্দ-লালের পত্র পড়িল। একবার দুইবার শতবার সহস্রবার পড়িল। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিলনা।' 'জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরাল না।'

[গোবিন্দলাল, রোহিণী, ভ্রমর এই তিনটি প্রধান চরিত্রের হৃদয়ের দ্বন্দ্বের কথা সবিস্তারে বলিয়াছি। পাঠকবর্গ অবশ্য জানেন, হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডির প্রাণ—তা' সে ট্র্যাজেডি নাটকাকারেই লিখিত হউক আর পদ্য বা গদ্য কাব্য-আকারেই লিখিত হউক। এ সম্বন্ধে A. C. Bradleyর Shakespearean Tragedy-নামক পুস্তকখানির প্রথম বক্তৃতায় (The Substance of Shakespearean Tragedy) বিশদ আলোচনা আছে। (উক্ত পুস্তকের ১৮শ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)]

তাহার পর, জীবনের শেষ দিনে তাহার সে অভিমান, সে কঠোরতা

সবই দূর হইল, মেঘ কাটিয়া তাহার বিমল প্রকৃতি প্রকাশ পাইল, প্রণয়-সূর্য্য মেঘের অন্তরাল হইতে দেখা দিল, 'নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।' সেই ফুলশয্যায় মৃত্যুশয্যাশায়িনী হইয়া সে বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন...স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।...আজিকার দিনে—মরিবার দিনে, দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম। একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।" 'একবার দেখা দিদি। ইহজন্মে আর এক বার দেখি। এই সময় আর একবার দেখা'। (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।)

'ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ * মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।'

এই মর্ম্মভেদী দৃশ্যের পর ভ্রমরের চরিত্র-ব্যবচ্ছেদ শব-ব্যবচ্ছেদের মতই নিষ্ঠুর হইবে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় ও একান্ত বিশ্বাসেরই অনিবার্য্য পরিণতি অভিমান ভ্রমরের একমাত্র অপরাধ; সেই অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, না, না, প্রায়শ্চিত্ত অপরাধকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাহার পতিপ্রেমের পতিভক্তির সতীত্বের তেজোমাধুর্য্যই আমাদের হৃদয়ে স্থায়িভাব মুদ্রিত

* ভ্রমরও যে গোবিন্দলালের গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। 'কেননা রমণী ক্ষমাময়ী দয়াময়ী স্নেহময়ী।' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) গোবিন্দলালের পত্র-পাঠমাত্রই যে তাহার হৃদয় দ্রব হইয়াছিল, তাহার চোখের জলে যে গোবিন্দলালের অপরাধ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল, ইহা সহৃদয় পাঠক-মাত্রই বুঝেন। তথাপি পত্রোত্তরে কঠোরতা—ইহাই রমণী-হৃদয়ের রহস্য।

করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমরাও নিঃসংশয়ে বলি 'ভ্রমর স্বর্গে'র দেবী' (২য় খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ)।* ভ্রমরের স্বর্ণপ্রতিমা-গঠন † ও পাদ-পীঠে ক্ষোদিত বাক্য হইতেও বুঝা যায়, গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে ভ্রমরের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিতেছেন। ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী ধৃষ্টতামাত্র।

সমাপ্ত

* "স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর নিজের মতে* সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর।" বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ—৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (বসুমতী গ্রন্থাবলি সিরিজ।) এই প্রসঙ্গ অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'য় (শ্রাবণ ১৩০১, ২৪৯ পৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

† এই স্বর্ণপ্রতিমা স্বর্ণসীতার সহিত তুলনীয় না হইলেও জুলিয়েটের স্বর্ণপ্রতিমার সহিত তুলনীয়।
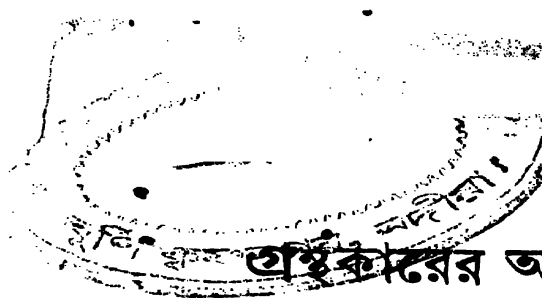
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-বিষয়ক

কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ, বোনে বোনে ইত্যাদি)
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)
সখী (বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আখ্যায়িকা-অবলম্বনে)
প্রেমের কথা (

ভাষা-বিষয়ক

ব্যাকরণ-বিভীষিকা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)
বাণান-সমস্যা (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

অন্যান্য

সাহারা (সচিত্র)
ফোয়ারা (শোভন ৪র্থ সংস্করণ)
পাগলা ঝোরা (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)
অনুপ্রাস (২য় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ)
ককারের অহঙ্কার (২য় সংস্করণ)
মোহিনী (ছোট গল্প)

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা